মহাবিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ

—সমর বসু

প্রকাশক—
শ্রীঅমলেন্দু মজুমদার
দি মডার্ণ পাবলিশারস্,
৮-এ, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ—
১৭ই আগষ্ট,
১৯৫২

মুদ্রাকর—
শ্রীঅজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বাণীলেখা প্রেস,
৭বি, রামমোহন সাহা লেন,
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের

শ্রীচরণকমলে—

পূর্ব কথা

১৩৫৭ সালের প্রবাসীর ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যায় "মহা-বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ", এই শিরোনামে আমার কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। রচনাগুলি পরে আমি পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে পাঠাই। নলিনীদা (শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত), শ্রীঅরবিন্দ বসু, শ্রীশিশিরকুমার মিত্র প্রমুখ সাধক ও মনীষীবৃন্দ রচনাগুলি পড়েন এবং উৎসাহোদ্দীপক অভিমত প্রকাশ করেন। তখন রচনাগুলিকে একত্র সংবদ্ধ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার কোনও চিন্তা আমার মাথায় ছিল না। এই বৎসর শ্রীঅরবিন্দের শততম আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হল শ্রীঅরবিন্দের ভাব-ধারার সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় ঘটানো। দুই বৎসর আগে এই লক্ষ্য সামনে রেখেই প্রবাসীতে প্রকাশিত উক্ত রচনাগুলিতে শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের দুরূহ ও গভীর তত্ত্বগুলি সহজবোধ্য ভাষায় এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সাধারণ পাঠকের কাছে উপস্থাপন করতে প্রয়াসী হয়েছিলাম।

কিছুদিন আগে শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের কৃপায়ই বলতে হবে; রচনাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের সম্ভাবনা দেখা দেয়—The Modern Publishers এর মাধ্যমে। আমি সঙ্গে সঙ্গে নলিনীদাকে চিঠিতে সব কথা জানাই এবং প্রকাশের অনুমতি ও শ্রীমায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। যথা সময়ে নলিনীদা শ্রীমায়ের আশীর্বাদ সহ তাঁর প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানালেন। এবং তদনুসারে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হল।

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম ও সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত বহু প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানেও এই ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই সব প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ ক'রে তার রূপায়ণের ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীঅরবিন্দের বিভিন্ন গ্রন্থের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা তার মধ্যে অন্যতম। এই রকম একটি প্রতিষ্ঠানে শ্রীঅরবিন্দের "The Ideal of Human Unity" গ্রন্থের একটি অধ্যায় সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল; সেই আলোচনা-সভায় এসে যোগদান করলেন একজন অধ্যাপক, যিনি শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত নন অথচ পণ্ডিচেরী আশ্রম দর্শন করেছেন। আশ্রম দর্শন করে এসে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন তাঁর মনে জাগে। সেই প্রশ্নগুলির যথাযথ সমাধানের উদ্দেশ্যেই তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানে আসেন এবং শ্রীঅরবিন্দ অনুরাগী ভক্তদের কাছে প্রশ্নগুলি তুলে ধরেন।

আমরা জানি যাঁরা দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করতে যান,—তাঁদের Tour Programme এ "পণ্ডিচেরী আশ্রম দর্শন"ও একটা 'আইটেম্' হিসাবে থাকে। আশ্রম দর্শন করে এসে তাঁদের মধ্যে কারও কারও মনে হয়তো শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কিছু জানবার কৌতূহল জাগে। অথচ সেই ধরনের মানুষ কিংবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ না হলে, তাঁদের কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটে না; সাধারণভাবে এই অসুবিধার কথা চিন্তা করে, যাঁরা আশ্রম দর্শন করেছেন এবং যাঁরা করেননি অথচ জানতে উৎসুক, তাঁদের সকলকার কথা ভেবে—উপরোক্ত কাহিনী অনুযায়ী কয়েকটি কাল্পনিক চরিত্র এবং ঘটনা সৃষ্টি করে, প্রাচীনযুগের ঔপনিবদিক পন্থা অনুসরণ করে, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাঁদের কৌতূহল নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে প্রবাসীতে প্রকাশিত নিবন্ধগুলি রচনা করেছিলাম। পুস্তকাকারে প্রকাশ করার সময় মনে হল—ঐ পুরানো ধারাটি বদলানো দরকার। তাই কাঠামোটার অদল-বদল কিছু করতে

হয়েছে। যে ভাবনাটি সমগ্র রচনার মধ্যে নিবিড় ভাবে বিধৃত, কাঠামো বদলাতে গিয়ে সে ভাবনাটি যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে অবশ্য লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

প্রবন্ধগুলির শিরোনাম অনুসারে পুস্তকটিরও নাম দেওয়া হয়েছে—"মহাবিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ"। ১৯০৫-১০ সালের বাবু অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়কেই লোকে বিপ্লবী বলে জানেন। কিন্তু এই পুস্তকে সে-বিপ্লবের কথা নেই। যে বিপ্লব ঘটানোর জন্য তাঁকে হঠাৎ অন্তঃপুরুষের আদেশে পণ্ডিচেরী চলে যেতে হয়েছিল,—সেই আধ্যাত্মিক বিপ্লবের কথাই এখানে বলা হয়েছে।

মানবজাতি আজ বিবর্তনের এক পর্বসন্ধিতে এসে দাঁড়িয়েছে। তার আড়ালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার পথ বেছে নেবার তাগিদ। মানুষের মন একটা বৈষম্যের ফেরে পড়েছে। কোনও কোনও বিষয়ে যেমন তার অসম্ভব উৎকর্ষ ঘটেছে, তেমনি আর একদিকে পথহারা উদ্‌ভ্রান্তের মত মাঝপথে সে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। তার নিত্যচঞ্চল প্রাণ আর মন বহির্জীবনের এমন একটা কাঠামো গড়ে তুলেছে—যার বিপুল আর দুর্বল জটিলতার যেন আর অন্ত নেই। দেহ, প্রাণ আর মনের সকল দাবী, সকল ক্ষুধা মেটাতে, সমাজে, রাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রে জীবিকায় এবং সংস্কৃতিতে সে এনেছে অভাবনীয় বৈচিত্র্য। দেহ, ইন্দ্রিয়বুদ্ধি এবং রসচেতনার তর্পণের জন্য সে পুঞ্জিত করেছে নানা উপকরণের বিপুল সম্ভার। কিন্তু মানুষের মন ও বুদ্ধির সামর্থ্য সীমিত—আরও সীমিত তার ধর্মবোধ এবং অধ্যাত্মচেতনার সামর্থ্য। অথচ এই দিয়ে যে অতিকায় সভ্যতার সৃষ্টি সে করেছে, তাকে তার প্রমত্ত অহং এবং ক্ষুধিত বাসনা কী করে যে সামাল দেবে বলা কঠিন।...

...জগৎ জুড়ে আজ দক্ষযজ্ঞের বিপ্লব চলেছে। চারিদিকে দেখছি শুধু মনগড়া আদর্শের হানাহানি, ব্যষ্টি বা সমষ্টির স্থূল বুভুক্ষার তাড়না, অন্ধ প্রাণাবেগ এবং উদ্দাম কামনার মাতামাতি, ব্যক্তির, শ্রেণীর কি জাতির স্বার্থসাধনার তুমুল কোলাহল। সমাজদর্শনে,

রাজনীতিতে এবং অর্থনীতিতে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে কত হাতুড়ে মতবাদের জটলা। ভূয়া আদর্শ প্রতিষ্ঠার নামে চারিদিকে শুনছি জগাখিচুড়ি গোছের নানা জিগির—যার জন্য জুলুম করতে কি জুলুম সইতে, মরতে কি মারতে মানুষের দ্বিধা নেই। আর নিজের মতকে প্রলয়ঙ্কর মারণ-যন্ত্রের সাহায্যে পরের গলার তলায় ঠেলে দিয়েই মানুষ মনে করছে এবার আদর্শ-লোকে পৌঁছুবার রাস্তা মিলল।.......

এই সংকট মুহূর্তে জীবন সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে আধুনিক মানুষ আশ্রয় করেছে বৈজ্ঞানিকের যুক্তি শাসিত জড়বাদ আর প্রাণবাদ। নিখুঁত জীবিকাসংস্থান যুক্ত সমাজতন্ত্র আর প্রাকৃতজনের উপযোগী গণতন্ত্র, তাকে সর্বনাশের হাত হতে বাঁচাবে—এই তার ভরসা। এ সমাধানের মধ্যে সত্য যতটুকু থাকুক, মানুষের ঈপ্সিত প্রগতির পক্ষে একে যথেষ্ট মনে করা চলেনা। কেননা, মানুষ আজকার মত জড় আর প্রাণকেই তো চিরকাল আঁকড়ে থাকবে না। তার নিয়তি প্রতিনিয়ত তাকে আকর্ষণ করছে এক সবছাপানো চিন্ময় সার্থকতার দিকে। জগতে সর্বত্র জেগেছে একটা বিপ্লবের আলোড়ন। জাতির প্রাণচেতনা, এমন কি সাধারণ মানুষের মনও আজ জেগে উঠেছে কী এক অতৃপ্তি নিয়ে। সে চায় অতীতের আদর্শ পালটে দিয়ে একটা নূতন আদর্শের নিশানা, চায় জীবনকে একটা নূতন ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে। সমাজ জীবনে ঐক্য চাই, সৌষম্য চাই, চাই পরস্পরের সঙ্গে আত্মসংমিশ্রণ। কিন্তু কি তার উপায়?—যেমন করেই হোক মানুষের 'অহং'এ 'অহং'এ যে প্রতিযোগিতা আর রেষারেষি, তাকে দাবিয়ে দিয়ে ভেদজর্জর সমাজে জাগিয়ে তুলতে হবে অভেদ সিদ্ধির একটা সহজ কৌশল। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই। কিন্তু উপায় সুষ্ঠু কিনা,—সন্দেহ সেইখানেই। ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রকাশকে ঠেকিয়ে রেখে শুধু বাছা বাছা দু'চারটি ভাবকে গায়ের জোরে বাস্তবে রূপ দেবার জিগির তোলা, ব্যক্তির স্বাধীন

চিন্তার টুঁটি চেপে ধরা, জীবনের মুক্তধারাকে যান্ত্রিকতার সংকীর্ণ খাতে বইয়ে দেওয়া, প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত চলনে আনা একটা কৃত্রিম একত্ব ভাবনার আড়ষ্টতা,—রাষ্ট্রের হাড়িকাঠে মানুষকে বলি দেওয়া, ব্যক্তির অহংএর জায়গায় সম্প্রদায়ের অহংকে ঈশ্বর করা—এই হয়েছে আজ জীবনসমস্যা সমাধানের উপায়। দলের অহংকেই জাতি সমাজ বা রাষ্ট্রের আত্মা বলে ঘোষণা করা একটা বিষম ভুল,—যা' শেষ পর্যন্ত আনতে পারে মহতী বিনষ্টি।...কিন্তু মানুষের দিব্যনিয়তির সঙ্কেত তো এই মূঢ়তার দিকে নয়। মহাপ্রকৃতি বহু পূর্বেই এর বিড়ম্বনা চুকিয়ে এসেছে। সুতরাং আবার তার মধ্যে ফিরে যাওয়া কখনও প্রগতির নিশানা হতে পারেনা।

বস্তুতন্ত্র অর্থনীতির একটা সর্বজনীন পরিকল্পনা খাড়া করে মানুষের জীবিকার সমস্যা মেটালেই জীবনের সকল সমস্যা মিটে যাবে—এমন একটা মত আজকাল প্রচারিত হচ্ছে। তারও উপায় হল সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টি প্রাণ-মনের কণ্ঠরোধ করে যান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ঘাড়ে কৃত্রিম একত্বের একটা বোঝা চাপানো। মানুষের প্রাণ-মনকে পিষে একাকার করে ঐক্য এনে উইপোকার সমাজের মত কর্মপটু একটা স্থানু সমাজ নিশ্চয় গড়া চলে। তাতে জীবনের গতানুগতিকতা বজায় থাকবে, কিন্তু প্রাণের উৎস যাবে শুকিয়ে। আর তাই জাতিকে ঠেলবে দ্রুত বা বিলম্বিত অবক্ষয়ের দিকে। একমাত্র ব্যক্তি চেতনার প্রসারে এবং সমৃদ্ধিতে গোষ্ঠীর চিৎসত্ত্ব এবং সাধনা আত্মসচেতন হয়ে প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। প্রাণ এবং মনের প্রমুক্ত স্বাতন্ত্র্যেই চেতনার সম্যক বিকাশ সম্ভবপর।....

বর্তমান সমস্যার আরেকটা সমাধান হচ্ছে, সাধারণ মানুষের বুদ্ধি এবং ইচ্ছাশক্তিকে শিক্ষাদীক্ষায় এমন মার্জিত করে তোলা যে নতুন সামাজিক সংহতির শরিক হয়ে স্বেচ্ছায় সে তার অহংকে গোষ্ঠী জীবনের সুশৃঙ্খলা বজায় রাখতে বলি দিতে পারে। যদি প্রশ্ন হয়—

জীবন ধারার এমন আমূল পরিবর্তন কি করে সম্ভব, তাহলে তার জবাবে পাই দুটি পরিকল্পনা। একটি হল ব্যক্তিকে নানা তথ্য ও তত্ত্বের জ্ঞান দিয়ে তার মনের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তাকে সুষ্ঠু ভাবনায় অভ্যস্ত করে তোলা। আরেকটি হল, এমন এক সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা, যার মন্ত্রশক্তিতে চক্ষের নিমেষে মানুষ কলে-ছাঁটা আদর্শ জীব হয়ে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু মানুষের আশা আর কল্পনা যা-ই বলুক, বাস্তবের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, শিক্ষায় বুদ্ধি মার্জিত হলেই কারও হৃদয় বদলায় না।...আবার সমাজের কলে ফেলে মানুষের প্রাণমনকে আজও কোনও আদর্শের ছাঁচে ঢালাই করা সম্ভব হয়নি।...আত্মা আর প্রাণকে কখনও কলে ফেলে ছকমাফিক রূপ দেওয়া চলে না।...

জড়তন্ত্রিত জীবন ও সমাজের চাপে পীড়িত মানুষ আবার হয়তো মুক্তির খোলা হাওয়া খুঁজবে ধর্মের মধ্যে—যন্ত্রের শাসনের চাইতে ধর্মের অনুশাসনকেই সে ভাববে শ্রেয়োলাভের উপায়। বিধিবদ্ধ ধর্ম ব্যক্তির অন্তরকে উদ্বুদ্ধ ক'রে সাক্ষাৎভাবে কি প্রকারান্তরে তার আধ্যাত্মিক বিকাশের পথ করে দিয়েছে সত্য, কিন্তু মানুষের সমাজ ও জীবনধারাকে বদলে দিতে সেও পারেনি। তার কারণ সমাজকে চালাতে গিয়ে প্রাণের নীচুতলার সঙ্গে অনেক জায়গায় তাকে রফা করতে হয়েছে। তাই সমগ্র সমাজ-প্রকৃতির আমূল রূপান্তরের সামর্থ্য কি সুযোগ তার মেলেনি।...মানুষ এমন প্রত্যাশাও করেছে : সমাজ যদি সিদ্ধ মহাজনদের প্রদর্শিত পথে চলে ...তা হ'লে হয়তো মানব প্রকৃতির অভীষ্ট রূপান্তর আসতে পারে। কিন্তু মানুষের এমনতরো প্রচেষ্টা এর আগে কোথাও সফল হয়নি। ...মানুষের মজ্জাগত অহমিকা এবং প্রাণবাসনা এতই উদ্দাম যে, মনেরই সহায় মনের কানে হাজার ধর্মের কাহিনী গুঞ্জরণ করেও তাদের বাধাকে নির্জিত করা যায় না। একমাত্র জীবচেতনার পরিপূর্ণ উন্মেষে...চিৎপুরুষের স্বরূপ জ্যোতি ও স্বরূপশক্তির পরিপূর্ণ

আবেশে····প্রাকৃত বিবর্তনের অঘটনও এই মর্ত্যের আধারে সংঘটিত হতে পারে।"···

তাঁর The Life Divine গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে মানবজাতির উদ্দেশ্যে শেষ আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ। এবং সেই আশ্বাসবাণী তাঁর ব্যক্তিগত কোনও 'আশার কথা' নয়, তাহ'ল বিধাতার যা ইচ্ছা তাই। কেননা, শ্রীমায়ের কাছ থেকে আমরা জেনেছি—"What Sri Aurobindo represents in the world history is not a teaching, not even a revealation, it is a decisive action direct from the Supreme."

তাঁর শততম আবির্ভাব বর্ষে ভারতবাসী হিসাবে সমগ্র মানবজাতির কাছে আমাদের কিছু কৃত্য আছে,—সেই কৃত্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই আমার এই বিনীত প্রয়াস শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের চরণ বন্দনা ক'রে আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম।

আমরা জানি পৃথিবীতে যত মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন, যত চিন্তাশীল মনীষী, দার্শনিক, সমাজ-সংস্কারক, ধর্মপ্রচারক, রাজনীতিবিদ এসেছেন,—তাঁরা সকলেই চেয়েছেন মানবজাতিকে উন্নততর অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করতে। তার জন্য তাঁরা নানা পথেরও নির্দেশ দিয়েছেন। নানা সংগঠনও গড়ে তুলেছেন। এইভাবে সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে কয়েকটি বিপ্লব ঘটে গিয়েছে। সেই বিপ্লবগুলি সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিভিন্ন রচনায় যে সব মন্তব্য করেছেন—তার থেকে বিপ্লববাদ সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়

আমরা পেতে পারি।—এই আশায়, অতি সংক্ষেপে সেই মন্তব্যগুলি এখানে উদ্ধার করা হল।'—(১)

শ্রীঅরবিন্দের মতে, রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব জগতে মাত্র দু'বার ঘটেছে। প্রথম বিপ্লব ঘটে যখন বিশৃঙ্খল অসংযত গ্রামীন মানুষকে সুনিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে গ্রাম্য অরাজকতা দূর করে, নিয়মের শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য রাজতন্ত্রের প্রবর্তন করা হয়।—এই রাজতন্ত্র যখন উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী এবং অত্যাচারী শাসন ও শোষণের যন্ত্রে পরিণত হয়-তখন তাকে অপসারিত করে প্রজাতন্ত্রের প্রবর্তন সম্ভব করা হল দ্বিতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে। এই প্রজাতন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা পেয়েছি—স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ। স্বাধীনতার পথ ধরে আমরা গণতন্ত্রের, সাম্যের পথ অবলম্বন করে সমাজতন্ত্রের এবং মৈত্রীর পথ অনুসরণ করে সাম্যবাদের (communism) আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছি, যদিও আমাদের সে প্রয়াস এখনও পুরোপুরি সার্থক হয়নি।'

শ্রীঅরবিন্দের মতে, জগতে অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটেছে তিনবার। প্রথম বিপ্লব ঘটে যখন গ্রামীন সমাজ-ব্যবস্থায় Barter System অর্থাৎ পণ্যের বিনিময়ে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়। দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটেছিল যখন পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ধাতব মুদ্রার প্রচলন ব্যবস্থা কার্যকর করা হল। এবং এই ব্যবস্থায় যখন কাগজে লেখা প্রতিশ্রুতি পত্র প্রচলিত হল তখন ঘটল তৃতীয় বিপ্লব।

বর্তমানে সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোকে Finance ও Economy এই দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রকৃত Financial বিপ্লব ঘটেছিল যখন দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতি পত্র অর্থাৎ হুণ্ডী, Bill of Exchange ইত্যাদির ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল। এর ফলে এক ধরনের Capitalism-এর জন্ম সম্ভব হয়েছে যাকে অবশ্য প্রকৃত অর্থে Capitalism বলা চলে না। 'Economy'র দিকে প্রকৃত

বিপ্লব ঘটেছিল যখন পণ্যের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় মানুষের শ্রম শক্তির পরিবর্তে বিদ্যুৎ এবং বাষ্পের শক্তিকে কাজে লাগানো হয়েছিল। এর ফলে উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতি হওয়ায় কলকারখানা গুলির উৎপাদন ক্ষমতা যেমন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনি, জাহাজ মোটর ও এরোপ্লেন প্রভৃতি দ্রুতগামী যানবাহনের ব্যবস্থা চালু হওয়ায় উৎপাদিত পণ্যাদির বণ্টনের জন্য দূর-দূর দেশের 'Market' গুলিও সহজলভ্য হয়েছিল। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে Industrialism এবং Commercialism নামক অত্যন্ত জটিল ও প্রভূত ক্ষমতাপরায়ণ দু'টি অর্থনৈতিক তত্ত্বের জন্ম সম্ভব হয়েছে। ইতিহাসে যদিও এই বিপ্লব Industrial Revolution বা শিল্প বিপ্লব নামে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছে তবুও উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার এই পরিবর্তনকে শ্রীঅরবিন্দ ঠিক বিপ্লব বলে স্বীকৃতি দেননি। কেননা, তাঁর মতে এই পরিবর্তনের দ্বারা সামগ্রিক ভাবে মানবজাতির কোনও কল্যাণ সাধিত হয়নি। যে-জাতির পক্ষে অর্থনৈতিক লাভ কিছু ঘটেছে, সেই জাতির কাছে অপর জাতিকে হতে হয়েছে অর্থনৈতিক শিকার।

শ্রীঅরবিন্দের মতে জগতে নৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এসেছে পাঁচবার। প্রথম বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন বুদ্ধদেব। তিনি সত্যের দৃষ্টিভঙ্গীকে জৈব ব্যবহারের মধ্যে সক্রিয় করে তোলবার প্রথা প্রবর্তন করেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিপ্লব এনেছিলেন যথাক্রমে কনফুসিয়স্ এবং যীশুখ্রীষ্ট। কনফুসিয়স্ সঙ্গতির দৃষ্টিভঙ্গীকে এবং খ্রীষ্ট প্রেমের দৃষ্টিভঙ্গীকে জৈব ব্যবহারের মধ্যে সক্রিয় করবার প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। এর পরের দুইটি বিপ্লবের দ্বারা অহিংসার দৃষ্টিভঙ্গীকে জৈব ব্যবহারে সক্রিয় করেন জৈন জিনগন এবং ক্ষমা ও দয়ার দৃষ্টিভঙ্গীকে দৈব ব্যবহারে সক্রিয় করার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন জৈন বুদ্ধগণ। এইভাবে আমাদের নৈতিক জীবনে পাঁচবার বিপ্লব ঘটে গিয়েছে।

এ ছাড়া শ্রীঅরবিন্দের মতে—আমাদের মনোরাজ্যেও কয়েকটি বিপ্লব ঘটেছে। এবং সে বিপ্লব ঘটিয়েছেন সিদ্ধ যোগিগণ। সরাসরি ভাগবত চেতনার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সাধনায় সিদ্ধ হবার পর মনের গতিতে যে পরিবর্তন এসেছে—তা'হল এই পর্যায়ের প্রথম বিপ্লব। দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটেছে তখন, সরাসরি ভাগবত চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে জগতের সর্বময় চেতনার সঙ্গে যুক্ত থাকার—সাধনায় সিদ্ধ হবার পর যখন মনের গতিতে পরিবর্তন এসেছে। তৃতীয়বার বিপ্লব ঘটেছে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকার সাধনায় সিদ্ধ হবার পর, চতুর্থ বিপ্লব ঘটেছে ভাগবত আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকার সাধনায় সিদ্ধ হবার পর, এবং ভাগবত আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থেকে জগতের রস-আস্বাদন করবার সাধনায় সিদ্ধ হবার পর মনের গতিতে যে পরিবর্তন এসেছে তাইতেই ঘটেছে মনোরাজ্যের পঞ্চম বিপ্লব।

মনোরাজ্যের এইসব বিপ্লব ঘটে যাবার পর একদল মানুষ—Divine Creation-এ অর্থাৎ স্রষ্টার অন্তরালে একটি শক্তি ক্রিয়াশীল, এই তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়েছেন। তাহলে সামগ্রিক ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, মানবজাতির উন্নতি বিধানে যুগে যুগে যে সব বিপ্লব ঘটে গিয়েছে তার ফলে একদল মানুষ হয়েছেন—Evolution অর্থাৎ বিবর্তন বাদে বিশ্বাসী আর একদল হয়েছেন Dialectic অর্থাৎ দ্বন্দ্ববাদে বিশ্বাসী এবং অপর দলটি হয়েছেন Divine Creationএর তত্ত্বে বিশ্বাসী। বৈজ্ঞানিক Evolution বাদের তত্ত্বটি সাধারণভাবে স্বীকার করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ যদিও তিনি ছিলেন Divine Creationএর তত্ত্বে সম্পূর্ণ আস্থাশীল।

শ্রীঅরবিন্দের মতে এইসব বিপ্লবের দ্বারা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির কিছু পরিবর্তন ঘটলেও তার স্বভাবের আমূল রূপান্তর সাধিত হয়নি। কোনও কোনও বিপ্লবের ফলে হয়তো মানুষ গ্রহণ করেছে নৈষ্কর্ম-সন্ন্যাসবাদ আবার অন্য কোনও বিপ্লবের ফলে সমাজজীবনে কর্মের

উন্মাদনা এত প্রবল হয়ে পড়েছে যে, ধর্ম জীবন এমনকি নৈতিক জীবন থেকেও মানুষ সরে গিয়েছে অনেকদূরে। এই সব বিপ্লবের মাধ্যমে মানুষের জৈব প্রকৃতির যে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে এমন কোনও প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি। তাই জৈব-ব্যবহারের দিক থেকে মানুষ আজও আধা-পশুই থেকে গিয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দের মতে মানুষের যা সমস্যা তার সমাধান যদি একান্তই করতে হয় তাহলে মানুষের স্বভাবের, এবং স্বধর্মের আমূল পরিবর্তন সাধন করতেই হবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের বিভিন্ন গ্রন্থে বিধৃত বিভিন্ন তত্বগুলিকে একত্র সংবদ্ধ করে ফরাসী মনীষী P. B. Saint Hilaire "Sri Aurobindo The Future Evolution of Man" নামক যে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন, তার থেকে একটি উদ্ধৃতি আমরা স্মরণ করতে পারি—"If humanity is to survive a radical transformation of human nature is indispensable." নিজের সীমানা ছাড়িয়ে মানুষকে আরও উর্ধ্বে উঠতে হবে. কিন্তু জগৎ ত্যাগ করে নয়, জীবনকে অস্বীকার করে নয়।

বর্তমান দুনিয়ায় সমগ্র মনুষ্য সমাজ যে জটিল সমস্যায় জর্জরিত তার সমাধানের উদ্দেশ্যে মানুষকে কেন তার স্বভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে, সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন তাঁর 'The Life Divine' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে। তাঁর এই 'Magnum-opus' কেই আমরা তাঁর দর্শন ব'লে গ্রহণ করেছি। সুতরাং এই প্রসঙ্গে শেষ অধ্যায়ের কিছু কিছু অংশ [মূল রচনা এবং শ্রীমৎ অনির্বাণ কৃত তার অনুবাদ] পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির জন্য উদ্ধারযোগ্য বলে মনে করি।

'শ্রীঅরবিন্দ অ্যাকশন্' এর কর্মসূচী রূপায়ণের উদ্দেশ্যে আয়োজিত কোনও একটি সভায় ডাঃ মাখনলাল ধর মহাশয়ের "শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লববাদ" সম্বন্ধে প্রদত্ত ভাষণ অবলম্বনে।

"At present mankind is undergoing an evolutionary crisis in which is concealed a choice of its destiny ; for a stage has been reached in which the human mind has achieved in certain direction an enormous development while in others it stands arrested and bewildered and can no longer find its way. A structure of the external life has been raised up by man's ever-active mind and life-will, a structure of an unmanageable hugeness and complexity, for the service of his mental, vital, physical claims and urges, a complex political, social, administrative, economic, cultural machinery, an organised collective means for his intellectual, sensational, aesthetic and material satisfaction. Man has created a system of civilisation which has become too big for his limited mental capacity and understanding and his still more limited spiritual and moral capacity to utilise and manage, a too dangerous servant of his blundering ego and its appetites.

.......All that is there is a chaos of clashing mental ideas, urges of individual and collective physical want and need, vital claims and desires, impulses of an ignorant life-push, hungers and calls for life satisfaction of individuals, classes, nations, a rich fungus of political and social and economic nostrums and notion, a hushling medley of slogans and panaceas for which men are ready to oppress and be oppressed, to kill and be killed, to impose them some how or other by the immense and too formidable means at his disposal, in the belief that this is his way out to something ideal. ....

A rational and scientific formula of the vitalis-

tic and materialistic human being and his life, a search for a perfected economic society and the democratic cults of the average man are all that the modern mind presents us in this crisis as a light for its solution. Whatever the truth supporting these ideas, this is clearly not enough to meet the need of a humanity which is missioned to evolve beyond itself or, at any rate, if it is to live, must evolve far beyond anything that it at present is. A life-instinct in the race and in the average man himself has felt the inadequacy and has been driving towards reversal of values or a discovery of new values and a transfer of life to a new foundation. This has taken the form of an attempt to find a simple and ready-made basis of unity, mutuality, harmony for the common life, to enforce it by a suppression of the competitive clash of egos and so to arrive at a life of identity for the community in place of a life of difference. But to realise these desirable ends the means adopted have been the forcible and successful materialisation of a few restricted ideas or slogans enthroned to the exclusion of all other thoughts, the suppression of the mind of the individual, a mechanised compression of the elements of life, a mechanised unity and drive of the life-force, a coercion of man by the State, the substitution of the communal for the individual ego. The communal ego is idealised as the soul of the nation, the race, the community; but this is a colossal and may turn out to a fatal error······It is not in this direction that evolutionary Nature has pointed mankind ; this is reversion towards something that she had left behind her.

Another solution that is attempted reposes still on the materialistic reason and a unified organisation of the economic life of the race ; but the method that is being employed is the same, a forced compression and imposed unanimity of mind and life and a mechanical organisation of the communal existence. An unanimity of this kind can only be maintained by a compression of all freedom of thought and life, and that must bring about either the efficient stability of a termite civilisation or a drying up of the springs of life and a swift or slow decadence. It is through the growth of consciousness that the collective soul and its life can become aware of itself and develop, the free play of mind and life is essential for the growth of consciousness.......

An alternative solution is the development of an enlightened reason and will of the normal man consenting to a new socialised life in which he will subordinate his ego for the sake of the right arrangement of the life of the community. If we inquire how this radical change is to be brought about, two agencies seem to be suggested, —the agency of a greater and better mental knowledge, right ideas, right information, right training of the social and civic individual and the agency of a new social machinery which will solve everything by the magic of the social machine cutting humanity into a better pattern. But it has not been found in experience, whatever might have once been hoped, that education and intellectual training by itself can change man ; ......Nor can human

mind and life be cut into perfection············by any kind of social machinery; ··········Machinery cannot form the soul and life-force into standardised shapes············

There is the possibility that in the swing back from a mechanistic idea of life and society the human mind may seek refuge in a return to the religious idea and a society governed and sanctioned by religion. But organised religion············has not changed human life and society; it could not do so, in governing society, it had to compromise with the lower parts of life and could not insist on the inner change of the whole being; ············Another possible conception akin to the religious solution is the guidance of society by men of spiritual attainment············ This too has been attempted before without success············the human ego and vital nature were too strong for a religious idea working on the mind and by the mind to overcome its resistance. It is only the full emergence of the soul, the full descent of the native light and power of the spirit············that can effect this evolutionary miracle.

[The Life Divine—Book II Part II
Chap. XXVIII]

"Man's highest aspiration would then only indicate the gradual unveiling of the spirit within—the preparation of a higher life on earth"

[The Life Divine.]

'এই আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে—
এ দেহ মন ভূমানন্দময় হবে—'

—রবীন্দ্রনাথ

"Democracy was the protest of the human soul against the allied despotisms of autocrat, priest and noble; socialism is the protest of the human soul against the despotism of a Plutocratic democracy; Anarchism is likely to be the protest of the human soul against the tyranny of a bureaucratic socialism. A turbulent and eager march from illusion to illusion and from failure to failure is the image of European progress."

—Thoughts and Aphorisms,

Men die that man may live and God be born.

....

He who could save the race must share its pain;
This he shall know who obeys that grandiose urge.
The great who came to save this suffering world
And rescue out of Time's shadow and the law,
Must pass beneath the yoke of grief and pain;

....

He carries the cross on which man's soul
is nailed;

... ...

He is the victim in his own sacrifice.

... ...

He dies that the world may be new-born and live."

—Savitri

মহাবিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ

১৯০৮ সালের ২রা মে। রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ৪৮ নম্বর গ্রে-ষ্ট্রীটের বাড়ীটা তখনও যেন নিদ্রাচ্ছন্ন। থম্ থম্ করছে চারিদিক। এমন সময় সদলবলে সেখানে এসে হাজির হলেন স্বনামধন্য পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট্ মিঃ ক্রেগান্। সমস্ত পল্লীটা যেন হকচকিয়ে উঠল। ভারী ভারী বুটের শব্দ এবং একটা চাপা গুঞ্জরণ। যাদের ঘুম ভেঙেছে, ভীতি বিহ্বল চোখে তারা দেখল, চারিদিকে পুলিশ আর পুলিশ। ৪৮ নম্বর বাড়ীটাকে তারা ঘিরে ফেলেছে। বাড়ীর ভেতরে ঢুকেছেন ক্রেগান সাহেব আর তার অনুগত পার্শ্বচরেরা। সেখান থেকে ভেসে আসছে বিচিত্র ধরণের শব্দ আর মাঝে মাঝে ক্রেগান সাহেবের উৎকট চীৎকার। সেখানে নাকি থাকেন একজন মারাত্মক ধরণের বিপ্লবী, এবং তাঁকে ধরার জন্যেই এত তোড়জোড়।

ঘরের এককোণে কোঁচার খুঁটটি গায়ে দিয়ে এক ভদ্রলোক ঘুমুচ্ছিলেন। বাড়ীর মেয়েরা তাঁকে ডেকে তুলতে তিনি দেখলেন একদল সশস্ত্র পুলিশ তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, অন্যেরা এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। ক্রেগান সাহেব তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে তিনি স্বভাব সুলভ শান্ত গলায় সাহেবের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। সাহেব স্তম্ভিত। এই শান্তশিষ্ট লোকটাই তাহলে সেই ভীষণ বিপ্লবী! প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরাজ শক্তি যাঁর ভয়ে অস্থির। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে যিনি বিলাতে কাটিয়েছেন, সেখানকার গ্র্যাজুয়েট, প্রচুর যাঁর পড়াশোনা, অগাধ যাঁর পাণ্ডিত্য, যাঁর কলমের একটি আঁচড়ে সারা ভারতবর্ষ শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়িয়ে গর্জে উঠে, সেই মানুষটির এত দীনবেশ! সেই মানুষটি এত শান্ত, এত নিরীহ! অথচ তাঁকে ঘিরেই চতুর্দিকে বারুদের বিস্ফোরণ!

ক্রেগান সাহেব প্রশ্ন করলেন,—তোমার এমন দশা কেন ?

বিপ্লবী বললেন,—আমি যে গরীব,—তাই !

সাহেব ভ্রূ কুঁচকে বললেন,—ও ! সেই জন্যে তুমি ধনী হতে চাও,—এবং সেই কারণেই এই সব কাণ্ড ঘটিয়েছ ?

বিপ্লবী নীরবে হাসলেন। কথার কোনও জবাব দিলেন না।

ক্রেগান সাহেব সেই নিরীহ মানুষটির হাতে হাতকড়া এবং কোমরে দড়ি বেঁধে বাইরে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন। পরে অবশ্য দড়ি খুলে দেওয়া হয়েছিল।

খানা তল্লাসীর নামে তাঁর ঘরে যা ছিল—সব তছ্‌নছ্‌ করে দেওয়া হল। কত নাটক, কবিতা, কত মূল্যবান রচনার পাণ্ডুলিপি কত চিঠিপত্র—সব নষ্ট হয়ে গেল। কেননা পুলিশের বিবেচনায় সেগুলো সবই আবর্জনা। প্রয়োজনীয় যা, পুলিশ সে সব জিনিষ গুলোকে সযত্নে রক্ষা করল। তার মধ্যে ছিল এক টুকরো মাটির ঢ্যালা এবং তাঁর স্ত্রীকে লেখা বিপ্লবীর কয়েকটি চিঠি। মাটির ঢ্যালাটি বিপ্লবী নিজের কাছেই রাখতেন,—সেটি দক্ষিণেশ্বরের মাটি। পুলিশ ভেবেছিল ওটা বুঝি বোমা তৈরী করার কোনও উপাদান! তাই যত্ন করে সংগ্রহ করেছিল আদালতে Exhibit করবে বলে। ওরা আরও ভেবেছিল,—স্ত্রীকে লেখা চিঠির মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক গোপন তথ্য আছে, যা উদ্ধার করতে পারলে,—অনেক রহস্যের কিনারা পাওয়া যেতে পারে। যদিও পুলিশের সে সব আশা সফল হয়নি—তবুও তারা ঐ সব চিঠিপত্র গুলো সযত্নে রক্ষা করেছিল বলে, পরবর্তী কালে সেগুলো যখন আমাদের হস্তগত হল তখন আমরা সত্য সত্যই ঐ বিপ্লবীর জীবনের অনেক গোপন রহস্যের সন্ধান পেলাম।

চিঠির তারিখ—৩০শে আগষ্ট ১৯০৫। বিপ্লবী লিখেছেন তাঁর স্ত্রীকে।……

'তুমি বোধহয় টের পেয়েছ যাহার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার

ভাগ্য জড়িত সে বড় বিচিত্র ধরণের লোক! এই দেশে আজকালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য, কর্মের ক্ষেত্র,—আমার কিন্তু তেমন নহে। সব বিষয়েই ভিন্ন, অসাধারণ।...পাঁচজনের মতের আশ্রয় লইয়া তুমিও কি ওকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবে? পাগল তো পাগলামির পথে ছুটিবেই ছুটিবে, তুমি ওকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। তোমার চেয়ে তার স্বভাবই বলবান।......

আমার তিনটি পাগলামি আছে। প্রথম পাগলামিটি এই—আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন সবই ভগবানের। যাহা পরিবারের ভরণ-পোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকি রহিল ভগবানকে ফেরৎ দেওয়া উচিত। আমি যদি সব নিজের সুখের জন্য, বিলাসের জন্য খরচ করি, তাহা হইলে আমি চোর...। এই দুর্দিনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত, আমার ত্রিশকোটি ভাইবোন এই দেশে আছে,—তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জরিত হইয়া কোনও মতে বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের হিত করিতে হয়। কি বল! এই বিষয়ে আমার সহধর্মিণী হইবে তো?

দ্বিতীয় পাগলামিটা সম্প্রতি ঘাড়ে চাপিয়াছে। পাগলামীটা এই যে, কোনও মতে ভগবানের সাক্ষাদ্দর্শন করিতে হইবে। আজকালকার ধর্ম ভগবানের নাম কথায় কথায় মুখে নেওয়া, সকলের সমক্ষে প্রার্থনা করা—লোককে দেখানো আমি কি ধার্মিক! তাহা আমি চাইনা। ঈশ্বর যদি থাকেন তাহা হইলে তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোনও না কোনও পথ থাকিবেই। সে পথ যতই দুর্গম হোক, আমি সে-পথে যাইবার দৃঢ় সংকল্প করিয়া বসিয়াছি। একমাসের

মধ্যে অনুভব করিলাম, হিন্দু ধর্মের কথা মিথ্যা নয়; যে, যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে, সেই সব উপলব্ধি করিতেছি। এখন আমার ইচ্ছা তোমাকে সেই পথে লইয়া যাই।······

তৃতীয় পাগলামিটা এই যে, অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলো মাঠ, ক্ষেত্র, বন, পর্বত, নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি।···

আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারী বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছিনা,—জ্ঞানের বল। ক্ষাত্র তেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্ম তেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এইভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে, এইভাব নিয়া জন্মিয়াছিলাম, এইভাব আমার মজ্জাগত; ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠারো বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল।”······

চিঠি থেকে যে তথ্যগুলি আমাদের অতি মূল্যবান বলে মনে হয়েছে তা'হল এই যে, “এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে···ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠারো বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল।”······

আমরা জানি সাত বছর বয়স থেকে একুশ বছর বয়স পর্যন্ত বিপ্লবী বিলাতে ছিলেন। সুতরাং বিলাতে থাকাকালীনই 'সেই' বীজটা অঙ্কুরিত হয়েছিল এবং দৃঢ় ও অচল হয়েছিল। কিন্তু কখন এবং কেমন করে?

এই সময়—অর্থাৎ ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সের মধ্যে বিপ্লবীকে আমরা দেখেছি ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করে সমগ্র

ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমাজ-বিজ্ঞান-ইতিহাস-দর্শন-কাব্য-সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞান আহরণ করছেন। মাঝে মাঝে বিভিন্ন ভাষায় কবিতা লিখছেন। এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন দুরূহ সব পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হচ্ছেন। ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ! অধ্যয়নের তপস্যায় এই সময়ে তিনি ছিলেন গভীর ভাবে নিমগ্ন। কিন্তু অধ্যয়ন এবং জ্ঞান অর্জন ছাড়া আরও কয়েকটী ঘটনা এই সময়ে তাঁর জীবনে ঘটেছিল। চিঠির মধ্যে মনে হয় তারই ইঙ্গিত কিছু রয়েছে।

এই সময়ে কেম্ব্রিজের ইণ্ডিয়ান্ মজ্‌লিশে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে কয়েকটি অগ্নিগর্ভ ভাষণ দান করেছিলেন। ভারতবর্ষকে অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসনের নিষ্ঠুর শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য সকলকেই জীবন-পণ করতে হবে।—তাঁর মধ্যে যে স্বদেশ-প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হতে চলেছে তা প্রথম প্রকাশ পায় এই ভাষণের তীব্র এবং জ্বলন্ত শব্দের প্রতিটি উচ্চারণে। পরবর্তী ঘটনায় তাঁকে দেখি,—I. C. S. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েও—অশ্বারোহণ পরীক্ষায় ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত হতে। বিদেশী শাসকের হাতে পুতুল হয়ে, তাদের নির্দেশ অনুসারে স্বদেশকে শাসন করার চাকরি গ্রহণ না করার ইচ্ছাই তাঁকে অশ্বারোহণ পরীক্ষা থেকে বিরত থাকতে উৎসাহ দিয়েছিল—যদিও তাঁর পিতৃদেব চেয়েছিলেন, তিনি যেন ঐ চাকরি গ্রহণ করেন। এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটে, যা হয়তো ইতিহাসের দিক থেকে খুবই নগণ্য, কিন্তু বিপ্লবীর জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময় তিনি তাঁর অগ্রজ এবং আরও কয়েকজন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করেন,—তার নাম দেন Lotus and dagger। এই সমিতিতে তাঁরা সকলেই শপথ নেন যে, যতদিন তাঁরা জীবিত থাকবেন—ততদিন স্বদেশের মুক্তি সাধনায় ব্রতী থাকবেন।—অত্যন্ত স্বল্পায়ু এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে বিপ্লবীর মাতামহ

রাজনারায়ণ বসু প্রতিষ্ঠিত "সঞ্জীবনী সভা"র যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। কেননা,—দাদু আর নাতি—ওঁরা দুজনেই ছিলেন ইতালীর সর্বজন-প্রিয় নেতা জোসেফ ম্যাৎসিনির অনুরাগী। ম্যাৎসিনি প্রতিষ্ঠিত 'কারবোনারি'র অনুকরণে তাঁরা এই গুপ্ত সভা গড়ে তুলেছিলেন। বিপ্লবীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—এই গোপন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই অত্যাচারিত পরাধীন জাতিকে স্বাজাত্যবোধে উদ্‌বোধিত করা সম্ভব। পরবর্তী কালে লোক চক্ষুর আড়ালে থেকেই অত্যন্ত গোপনে তিনি সমস্ত বৈপ্লবিক কর্মধারা পরিচালনা করতেন। তাই ব্রিটিশ সরকার যতবার তাঁকে শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েছিল ততবারই ব্যর্থ হয়েছে। ক্রেগান সাহেবের রিপোর্ট, নর্টন সাহেবের নাটকীয় সওয়াল,—কিছুই ধোপে টিকল না—বিপ্লবী সসম্মানে মুক্তি পেলেন। সেদিনের তারিখটি ছিল—১৯০৯ সালের ৬ই মে। ঠিক একবছর পরে বিপ্লবী মুক্তি পেলেন। কিন্তু কারাগার থেকে—না, আলিপুরের আশ্রম থেকে বেরিয়ে এলেন—সে এক অন্য মানুষ! আলিপুর আশ্রমের নির্জন কক্ষে,—সবার অলক্ষ্যে পুরানো সেই মানুষটি কখন দ্বিজ হয়েছেন,—লাভ করেছেন নূতন জন্ম, পেয়েছেন নূতন পথের ইশারা, নূতন বিপ্লবের, নূতন জাগরণের, নূতন আবির্ভাবের আলোক বর্তিকা! বাইরের মানুষে তার কোনও খবরই পায়নি।

স্ত্রীকে লিখেছিলেন তিনি,—এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করার ভার ভগবান তাঁর উপর অর্পণ করেছেন, কিন্তু সেকি শুধু ভারতবর্ষের মানুষ! না সমগ্র মানবজাতি! সেকী শুধু বাইরের শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি!—না অন্তরের অন্ধতা, সীমাবদ্ধতা, খণ্ডতা আর অবর-প্রকৃতির দুরন্ত প্রভাব থেকেও!—দুরূহতর, কঠিনতর কাজ। তবু সেই কাজই তাঁকে সুসম্পন্ন করতে হবে—হবে, কেননা বিধাতার তাই অভিপ্রায়। স্ত্রীকে লেখা চিঠিতে যার আভাস আমরা পেয়েছি, উত্তরপাড়া অভিভাষণে পেলাম তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত।

ভারতবর্ষের মানুষকে প্রথমে জাগতে হবে—বিশ্ববাসীকে জাগিয়ে তোলার জন্য। এবং সেই কারণেই চাই ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা কিন্তু পরে তিনি জানলেন, দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ ঘটবেই, এবং তার জন্যে বাইরের দিক থেকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর আর করার কিছু নেই—তাঁর যা কাজ তা হ'ল—সমগ্র মানবজাতির ঊর্ধ্বায়ন, চেতনাগত একটি উন্নততর অবস্থায় মানবজাতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

কিন্তু বিপ্লব ছাড়া কেমন করে তা সম্ভব !—কেননা, আমরা তো জানি—মানবজাতিকে উন্নততর অবস্থায় উন্নীত হতে হলে--চাই শোষণহীন, শাসনহীন সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। এবং তার জন্যে চাই - দেশের রাষ্ট্রযন্ত্র, অর্থনৈতিক কাঠামো, উৎপাদন ব্যবস্থা—ইত্যাদি সব কিছুর আমূল পরিবর্তন। এবং এ-সবের জন্য চাই বিপ্লব।

হ্যাঁ, বিপ্লবই চাই! এবং সমগ্র মানবজাতিকে নিয়েই যখন বিপ্লব, বিশেষ রাষ্ট্র কিংবা জাতির মধ্যেই যখন সে-বিপ্লব সীমাবদ্ধ থাকবেনা, সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে, একটির প্রতিষ্ঠা এবং অপরটির বিলুপ্তিসাধন যখন সে বিপ্লবের উদ্দেশ্য নয়,—তখন সে বিপ্লব চালিত হবে অন্যভাবে, অন্য পথে। এবং যেহেতু এই বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকে হতে হবে স্বরাট, হতে হবে সম্রাট,—সেই হেতু এই বিপ্লবকে আমরা বলব মহাবিপ্লব। এই মহান ব্রত সাধনের জন্যেই---বিপ্লবী বাবু অরবিন্দ ঘোষ হলেন---মহাবিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ।

কিন্তু এতো হল—Statement of facts,—ঘটনার বিবৃতি। এর থেকে তো বোঝা যাবেনা মহাবিপ্লব কি? এবং কি কারণে শ্রীঅরবিন্দকে আমরা মহাবিপ্লবী বলব। সুতরাং বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। তারও আগে মনুষ্য জীবন সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে দু'একটি কথা বলা দরকার। কেননা—Revolution সম্বন্ধে

কিছু বলতে গেলে--Evolution অর্থাৎ বিবর্তনবাদের কথা আগে বলতে হয়। সুতরাং সেই ভাবেই সুরু করা যাক।

পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগতে প্রকৃতি-পরিণামবাদের (Evolution) যে ধারা প্রবহমান তাকে বর্ণনা করতে গিয়ে মুণ্ডকোপনিষদ বলেছে—

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ২।৩

এতস্মাৎ অর্থাৎ অক্ষরপুরুষাৎ। সেই অব্যক্ত পুরুষের মধ্যে নিহিত যে তেজ (Energy) তার থেকে উদ্ভূত হল আকাশ (Ether) তারপর সেই ঈথরীয় কণারাজির মধ্যে জাগল প্রবল কম্পন। সেই কম্পমান ঈথর-সমুদ্রকে বলা হয় 'যজু'—অর্থাৎ যা কম্পমান, যা স্পন্দনশীল, যা বহমান—অর্থাৎ বায়ু। জড়াণুর আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফলে প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি হল। জড় পৃথিবীর এই উত্তপ্ত অবস্থাকে বলা হয়—গ্যাসীয় অবস্থা। সেই জন্য সংস্কৃতে অগ্নিকে বলা হয়—বিশ্ববিবর্তনের ধারায় তৃতীয় অবস্থা। তারপর সেই প্রচণ্ড উত্তাপ যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল—গ্যাসীয় অবস্থা ক্রমশঃ শীতল হতে লাগল—তখন সেই গ্যাস তরল পদার্থে পরিণত হল। সংস্কৃতে একেই বলা হয় অপঃ। এই তরল অবস্থা আরও শীতল হবার পর জড়কণা একত্র সন্নিবিষ্ট হয়ে ক্ষিতির সৃষ্টি করল। এই ক্ষিতি যখন আরও শীতল হল—তখন জীবাণুর মধ্য দিয়ে প্রথমে উদ্ভিদ, পরে প্রাণী এবং তারও পরে মানুষের উদ্ভব সম্ভব হল।

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন্ আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যোঽন্নম্। অন্নাদ্রেতঃ। রেতষঃ পুরুষঃ। [তৈত্তিরীয় উপনিষৎ—২য় বল্লী]

'This is the first description of the principal stages of the cosmic evolution that we find in the Vedic literature. It is the corner-stone upon which the huge super-structure of the doctrine of evolu-

tion was built through rigorous process of science and logic by the later philosophers. Amongst the six principal schools of Philosophy in India, the Sankhya system of Kapila is devoted entirely to the systematic logical and scientific explanation of the process of cosmic evolution.......Kapila may be called the father of the evolution theory in India ....There is no ancient philosophy in the Western world which is not indebted to the 'Sankhya system of Kapila.' বলেছেন স্বামী অভেদানন্দ—আমেরিকায় প্রদত্ত তাঁর একটি ভাষণে। [From complete works voll VII—Chapter VII—Cosmic Evolution and its purpose—centenary publication].

কপিল ছিলেন খৃষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীর মানুষ। কপিলের এই তত্ত্বটি গ্রহণ করেন গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস (Pythagoras) পরে পশ্চিমের বহু দার্শনিক এই তত্ত্বের উপর বিস্তৃত আলোচনা করেন।

গত শতাব্দীতে প্রখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ Charles Darwin বিবর্তনবাদের তত্ত্বটি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমাদের সামনে নূতন ভাবে যা উপস্থাপন করেন, তার থেকে আমরা জানতে পারি যে, 'আদিতে পৃথিবীতে যা ছিল তা সবই Matter অর্থাৎ জড়'। কঠিন, গ্যাসীয় এবং জলীয় পদার্থ। এই পদার্থ থেকে প্রথমে Protoplasm, পরে শৈবালজাতীয় উদ্ভিদের বিকাশ ঘটল। তারপর এল জলজ প্রাণী (Sponge)। পরে উভচর খেচর এবং স্থলচর। আরও পরে গরিলা, ওরাংওটাং, বানর এবং তার থেকে মানুষ।

বিবর্তনধারার পর্যায়ক্রম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে Charles Darwin মানুষের আবির্ভাব পর্যন্ত এসে থেমে গিয়েছেন। মানুষের পর উন্নততর কোনও মানুষের অথবা অন্য কোনও জীবের আবির্ভাব সম্ভব কি না, এবং যদি সম্ভব হয়, তা হলে তা কি ধরনের হবে, সে

সম্বন্ধে Darwin সাহেব নীরব। সেই সঙ্গে সাধারণভাবে প্রায় সমস্ত পশ্চিমী মানুষও। পশ্চিমী জড়বাদী দর্শন প্রভাবিত চিন্তা চেতনায় এদেশের বুদ্ধিজীবিরা যেহেতু বিশেষভাবে প্রভাবিত সেই হেতু, এ দেশের আধুনিক মানুষও Darwin এর তত্ত্বকেই স্বীকার করে নিয়েছে, যদিও সে তত্ত্ব এখনও প্রমাণিত হয়নি। তাই মানুষের পরে কি হবে সে ব্যাপারে পশ্চিমী মানুষদের মত আমাদেরও কোনও মাথাব্যথা নেই। কিন্তু এ দেশের ঋষিরা অন্য কথা বলেন। গভীর তপস্যার সাহায্যে যে সত্য তাঁরা উপলব্ধি করেছেন তাতে ধরা দিয়েছে—এক বিশাল অধ্যাত্মজীবন যেখানে মানুষকে উত্তীর্ণ হতে হবে। মানুষ mental being, কিন্তু মনোজীবনই বিবর্তন-ধারার শেষ লক্ষ্য নয়।

সমগ্র মানবজীবনকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। তার একটি ভাগে দেহ, প্রাণ ও মন—অন্যভাগে বিশাল অধ্যাত্মজীবন। এখন এই তত্ত্বটি আগে স্বীকার করে নেওয়া দরকার, না হলে এর পরের আলোচনায় এগোন যাবে না। অবশ্য আলোচনা প্রসঙ্গে যুক্তি-তর্কের সাহায্যেই এ তত্ত্বটিও প্রমাণিত হবে।

অধ্যাত্মজীবনের কথা পরে হবে। এখন দেহ, প্রাণ ও মন নিয়ে যা সমস্যা সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাক। বিবর্তনের গতিপথে জীবের আকৃতিগত যে পরিবর্তন হয়েছে Darwin সাহেব তা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু অন্তর্জীবনে অর্থাৎ চেতনা-গত যে পরিবর্তনের ফলে মানুষ মনশ্চেতনার অধিকারী হয়েছে সে সম্বন্ধে তার কোনও মন্তব্য নেই। সুতরাং Darwin সাহেবের তত্ত্ব থেকে মানুষের আধখানা পরিচয়ই পাওয়া যায়। পুরো মানুষকে জানা যায় না। মানুষের যে দিকটাকে বলা হয় outer life অর্থাৎ বহির্জীবন, তাকে নিয়েই আমাদের যত ব্যস্ততা; এ ছাড়া মানুষের যে Inner life অর্থাৎ অন্তর্জীবন আছে, তার রহস্য সন্ধানে আমরা মোটেই উৎসুক নই। সেই জন্যই আমাদের জীবনকে ঘিরে যেসব

সমস্যা যুগে যুগে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তার সমাধানের জন্য আমরা যে সব উপায় উদ্ভাবন করি, তা সাময়িকভাবে যতই সার্থক হোক না কেন, পরিণামে ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ হয় এই কারণে যে, সমাধানের উপায় নির্ধারণ করতে গিয়ে আমরা মানুষের অন্তঃ-প্রকৃতিকে একেবারেই গণ্য করি না। মানুষের এই অন্তঃপ্রকৃতির রহস্যটিকে যুক্তি-বুদ্ধির সাহায্যে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন শ্রীঅরবিন্দ।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Human cycle গ্রন্থে মানুষের ক্রম-বিকাশের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।

কিন্তু যাঁরা সে-গ্রন্থ অধ্যয়ন করেননি তাঁদের জন্য সংক্ষেপে দু'একটি কথা বলা দরকার। সুতরাং আমরা সেই চেষ্টাই করব।

আমাদের উপনিষদে চেতনার কয়েকটি অবস্থার কথা বলা আছে— সুপ্তাবস্থা, স্বপ্নাবস্থা এবং জাগ্রত অবস্থা। পৃথিবীতে সবকিছুই যখন জড়ময় ছিল—তখন জড়ের মধ্যে চেতনা ছিল নিদ্রিত। চেতনার তখন সুপ্ত অবস্থা। তারপর শৈবালজাতীয় উদ্ভিদের জন্ম হল। এই উদ্ভিদে এসে চেতনার ঘুম ভাঙল। তবে পুরোপুরি নয়। ঘোর কাটেনি; আচ্ছন্নভাব ঘোচেনি। স্থাবর উদ্ভিদে চেতনার তাই স্বপ্নাবস্থা। এরপর পৃথিবীতে জন্মাল প্রাণী। চেতনা জাগ্রত হল। কিন্তু সে-চেতনা হল বহির্মুখী। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ। তাই প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধির বিকাশ ঘটল না। মানুষে এসে সেই জাগ্রত চেতনা হল অন্তর্মুখী। মানুষ মনঃ-শক্তির অধিকারী হল।

Darwin এর তত্ত্বের উল্টোপিঠে চেতনার এই বিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। Darwin তার সন্ধান পাননি, তাই সেকথা কাউকে জানাতেও পারেননি। চেতনার এই ক্রমবিকাশের ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। মনশ্চেতনার চেয়েও উচ্চতর শক্তিসম্পন্ন চেতনা

এখনও রয়েছে অনভিব্যক্ত অর্থাৎ Unmanifested : চেতনার এই চতুর্থ অবস্থার নাম—তুরীয় অবস্থা।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যা ছিল জড়, তাই একদিন দেহ পেল। পেল প্রাণ। যা ছিল দেহময়, প্রাণময়, তাই আবার একদিন মনোময় হয়ে উঠল। তাহলে আমরা অনায়াসেই বলতে পারি জড়ের মধ্যেই যেমন আবরিত ছিল দেহ-চেতনা, তেমনি দেহ-চেতনার মধ্যেই প্রাণ-চেতনা ছিল অবগুণ্ঠিত। এবং মনশ্চেতনা সেই প্রাণচেতনার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। আবরণ যেমন উন্মোচিত হয়েছে তেমনি ঘটেছে চেতনার বিকাশ। বাইরের কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চেতনারও ঘটেছে এই ক্রমোন্নতি। সুতরাং এই দুইটি তত্ত্বকে একসঙ্গে বুঝলে তবেই বিবর্তনবাদের সম্যক পরিচয় লাভ সম্ভব।

এইখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে—এই আবরণ উন্মোচনের ব্যাপারটা কেমন করে সম্ভব হল ? এ প্রশ্নের জবাব আমরা পরে দেবো।

জড়ের মধ্যে যেমন 'দেহ', দেহের মধ্যে যেমন 'প্রাণ' এবং প্রাণের মধ্যে যেমন 'মন' আবরিত হয়েছিল, ঠিক তেমনি মনের মধ্যে আবরিত হয়ে আছে অধ্যাত্মচেতনা। শ্রীঅরবিন্দ যার নাম দিয়েছেন অতিমানসচেতনা। সেই অধ্যাত্মচেতনাকে অভিব্যক্ত করাই হল মানুষের পরমতম অভীপ্সা।

মনশ্চেতনা উন্মীলিত হবার পর মনোময় মানুষ ক্রমবিকাশের এমন একটি স্তরে এসে উপস্থিত হয়েছে যেখান থেকে পরবর্তী স্তরে উত্তীর্ণ হতে হলে মানুষকে সচেতনভাবে সক্রিয় হতে হবে। কেননা মানুষ আত্মসচেতন জীব। জড় থেকে উদ্ভিদ্‌, প্রাণী এবং মানুষ পর্যন্ত ক্রমপরিণামবাদের গতি একান্তভাবে প্রকৃতির প্রভাবেই পরিচালিত হয়েছে। কেননা, সেখানে জড়, উদ্ভিদ কিম্বা প্রাণীর সক্রিয়ভাবে কিছু করার শক্তি ছিল না। কিন্তু মানুষ সে শক্তি

অর্জন করায় মানুষকে সচেতনভাবে সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে পরবর্তী স্তরে উন্নীত হবার জন্য। অবশ্য প্রকৃতি তাকে সাহায্য করবে। তমসার থেকে জ্যোতির্ময়ের দিকে চেতনার যে ক্রমগতি মানুষই হল সেই গতিপথে একটি উজ্জ্বলতম মাইল ষ্টোন্। কিন্তু শেষ লক্ষ্য নয়। শেষ লক্ষ্য অধ্যাত্মচেতনার উন্মীলন।

মনের ওপারে অর্থাৎ **beyond mind**—কোনও উচ্চতর চেতনা নেই—এই বিশ্বাস আধুনিক মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়েছে এই কারণে যে, মানুষ বুদ্ধি দিয়ে তার নাগাল পায় না। বুদ্ধির অধিগম্য যা নয়, তাকে স্বীকার করে নিতে আধুনিক মানুষ রাজী নয়। মানুষ সব-কিছু বুঝতে চায় যুক্তি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে। আজকের এই যুগটাকে সেই কারণে বলা হয় যুক্তিবাদীর যুগ অর্থাৎ Rational age. এযুগের মানুষের বিশ্বাস—যুক্তিবুদ্ধিই হল তার জীবনের নিয়ন্তা, তার পরিচালক। বুদ্ধির শক্তি তার মধ্যে কি করে বিকশিত হল সে তত্ত্বটি কিন্তু গভীরভাবে কেউ অনুধাবন করতে চায় না। আমরা চিরকাল কি Rational ছিলাম? প্রাগৈতিহাসিক যুগে, কিংবা ঐতিহাসিক যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে যখন আমরা sub-human বা অবমানবস্তরে ছিলাম তখন কোন্ শক্তি আমাদের পরিচালিত করত! Intellect না Instinct? Reason না Impulse?

তখন যেহেতু আমাদের মধ্যে বুদ্ধির বিকাশ ঘটেনি—সেইহেতু আমরা সহজাত প্রবৃত্তি এবং প্রবেগের দ্বারাই পরিচালিত হতাম।

তখন আমরা যে স্তরে ছিলাম শ্রীঅরবিন্দ তার নাম দিয়েছেন infra-rational stage. এরপর একটু একটু করে আমাদের মধ্যে বুদ্ধির উন্মেষ ঘটতে লাগল। আমরা Rational স্তরে উন্নীত হলাম। এখন প্রশ্ন হল, আমরা চিরকালই কি Rational হয়েই থাকব? না বুদ্ধির চেয়ে উন্নততর কোনও শক্তির অধিকারী হবো?

এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই হয়ত বলবেন—বুদ্ধির শক্তিই তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হবে। যেটাকে উন্নততর শক্তি বলা হচ্ছে তাকেই বলা যেতে পারে তীক্ষ্ণতর অথবা তীক্ষ্ণতম বুদ্ধি। অর্থাৎ ভবিষ্যতের মানুষ তীক্ষ্ণতম বুদ্ধির অধিকারী হবে একথা বলা যেতে পারে।

কিন্তু তীক্ষ্ণতম বুদ্ধির শক্তিরও সীমা আছে যার মধ্যে তার ক্রিয়াশীলতা। এবং তাকেই বলা যেতে পারে মানুষী সীমা অর্থাৎ human limitation. কিন্তু মানুষকে যে তার আপন সীমা অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হবে। কেননা, বিধাতার তাই অভিপ্রায়।

এখন প্রশ্ন হল, বিধাতার কি অভিপ্রায় তা আমরা জানবো কি করে? বুদ্ধি দিয়ে তো বিধাতাকে ধরাই যায় না। তাছাড়া বুদ্ধি তাকে স্বীকার করতেও চায় না।

বুদ্ধি যে বিধাতাকে স্বীকার করতে চায়না তার কারণ হল বুদ্ধির সে শক্তি নেই। যাই হোক—বিধাতার অভিপ্রায় সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব, এখন Rational স্তরের উপরে ওঠা মানুষের পক্ষে সম্ভব কিনা সেই প্রসঙ্গটা শেষ করি।

আমরা বলেছি, মানুষ আগে ছিল Infra-rational; সে সময় সে পরিচালিত হত Instinct এবং Impulse এর দ্বারা। পরে Rational স্তরে সে উন্নীত হল, বর্তমানে সে সেই স্তরেই রয়েছে। বর্তমানে সে তাই Intellect ও Reason এর দ্বারা পরিচালিত। ভবিষ্যতে মানুষ উন্নীত হবে Supra-rational স্তরে, তখন সে পরিচালিত হবে Intuition অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের দ্বারা। এখানে যে তত্ত্বটি বিশেষভাবে স্মরণীয় তা হল এই যে, বুদ্ধি হল একটি অন্তর্বর্তী Intermediary স্তর। তার আগে Instinct, পরে Intuition; এই Instinct এবং Intuition পরিচালনার ব্যাপারে কখনও ভুল করে না! যত ভুল তা সবই ঘটে Intellect এর দ্বারা। তাই Intuitionকে বলা যেতে পারে Instinct এর ঠিক উল্টোপিঠ।

এই বোধির অর্থাৎ Intuition এর সাহায্যে মানুষ তার অন্তঃ-

পুরুষের সন্ধান পাবে এবং তখনই সে জানতে পারবে আপনার স্বরূপকে, স্বভাবকে এবং স্ব-ধর্মকে। এই অন্তঃপুরুষেরই অন্য নাম চৈত্যপুরুষ। চৈত্যপুরুষ হলেন জীবাত্মার প্রত্যক্ষ প্রতিভূ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একেই বলেছেন 'পাকা আমি'। এই অন্তঃপুরুষকে না জানতে পারলে মানুষের পক্ষে তার বহির্জীবনের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা সম্ভব নয়।

আমরা কথায় কথায় প্রায়ই বলে থাকি মানুষের মধ্যে একটা dynamic force কাজ করছে। সে তাকে স্থির থাকতে দেয় না। তারই চাপে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে মানুষ। কোনও একটি বিশেষ অবস্থার মধ্যে আবদ্ধ থেকে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। 'চরৈবেতি' তার চলার মন্ত্র, 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনও খানে'. তার অন্তরে নিয়ত রণিত হচ্ছে এই সুর। সুতরাং কোন্ অনাগত ভবিষ্যতে তার সত্তার মধ্যে যে এক উচ্চতর চেতনার উন্মীলন সম্ভব হবে আজকের তীব্র অভীপ্সাই তার সূচনা। অতএব একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যেতে পারে যে, মানুষের মন হল সেই যোগসেতু যার এক পারে আছে অবমানব আর অন্য পারে অতিমানব। এক পারে **Infra rational** অন্য পারে **Supra rational.**

যদি প্রশ্ন করা হয়, মানুষ যে চিরকাল মানুষ হয়েই থাকবেনা, কোনও উচ্চতর চেতনায় যে তাকে অতি অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, এ নিশ্চয়তা কোথায়? যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে যার নাগাল পাবো না বুদ্ধিবাদী মানুষ হিসাবে তাকে মেনে নিই কি করে?

তাহলে তার উত্তরে বলা যেতে পারে, যুক্তি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে যখন কোনও তত্ত্বকে আমরা সত্য বলে প্রমাণ করতে চাই তখন প্রথমে কতকগুলো **facts** অথবা উপকরণকে **hypothesis** বলে

আমরা ধরে নিই। তারপর তাকে অবলম্বন করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হই এবং তার থেকে সাধারণ সূত্র নির্ণয় করে বলে থাকি,—such and such conditions will produce such and such results.

এখানে আমরা কি দেখছি? আমরা দেখছি—জড়ের মধ্যে অবগুণ্ঠিত ছিল যে চেতনা তার ক্রমোন্মীলন। এখন জড়ের মধ্যে যে চেতনা আবরিত ছিল সে-চেতনার স্বরূপ কি তা যদি আমরা ধরতে পারি, তা হলে ক্রমোন্মীলনের কোনও পর্যায়ে এসে এ-কথা বলা আমাদের পক্ষে এমন কিছু কঠিন হবে না যে, উন্মীলন এখনও বাকী আছে, কি নেই। ১০০ ফুট দীর্ঘ একটি ফিতেকে যদি একটি আধারে গুটিয়ে রাখা যায়, তাহলে খুলতে খুলতে যখন ৯০ কি ৮০ ফুট বেরিয়ে আসে তখন আমরা কি বলতে পারি না যে, এখনও সবটা খোলেনি, এখনও দশ কি বিশ ফুট বাকী আছে!

সুতরাং জড়ের মধ্যে যে চেতনা অবগুণ্ঠিত ছিল তার স্বরূপ কি এ-কথা যিনি জানেন তিনিই একমাত্র বলতে পারেন—মানুষের মধ্যে যে মনশ্চেতনা বিকশিত হয়েছে—ক্রমোন্মীলনের ধারায় সেই চেতনাই শেষ স্তর কিনা!

যদি জানা যায় যে পরম চেতনা অর্থাৎ Supreme Consciousness Matterএর মধ্যে আবরিত হয়ে ছিল তা হলে একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যেতে পারে যে, process of unfolding ততদিন অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে যতদিন না সেই পরম চেতনা পুরোপুরি অভিব্যক্ত হচ্ছে। Supreme consciousness বা পরমচেতনাই জড়ের মধ্যে আবরিত ছিল কিনা তা আমরা পরে আলোচনা করব। এখন, মানুষ যে চেতনার অধিকারী হয়েছে—অর্থাৎ মনশ্চেতনা, তার স্বরূপ কি এবং তার শক্তি কতখানি তা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। কেননা, তাহলেই আমরা বুঝতে পারব যা পেয়েছি তাইতেই আমাদের চলবে কিনা!

মানুষ প্রথমে চায় গ্রহণে বর্জনে এই দেহটিকে রক্ষা করতে। তারপর সে চায় নানা রকম কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে জীবন্ত রাখতে, সবশেষে তার আছে কৌতূহল,—সে জানতে চায়, বুঝতে চায়। মানুষের এই ভোগৈষণা, কর্মৈষণা ও জ্ঞানৈষণা যথাক্রমে তার দেহ, প্রাণ ও মনের কাজ। দেহ হল ভোগের আয়তন, প্রাণ হল কর্মের এবং মন হল জ্ঞানের আয়তন। দেহ ও প্রাণ নিয়ে মানুষের পশুভাব, মন নিয়ে মানুষের মানুষীভাব, আর তুরীয় জ্ঞান ও আনন্দ নিয়ে মানুষের দেবভাব।

যে চারিটি ভাবনার সোপানকে অবলম্বন করে মানুষের ক্রমোন্নতি তা যদি বিশ্লেষণ করি, তাহলে আমরা দেখতে পাই যে মানুষের প্রাথমিক পরিচয় হল যে, সে স্বার্থপর। তার প্রথম ভাবনা হল কি করে সে ব্যক্তিগত কামনা-বাসনাকে পরিতৃপ্ত করবে। তারপর তার দ্বিতীয় ভাবনা হল,—কি করে সে গোষ্ঠীগত জীবনের আইন কানুন মেনে সকলকার জন্যে বেঁচেবর্তে থাকবে, শুধু একলার জন্যে নয়। তার তৃতীয় ভাবনা—সুনীতির আদর্শ অনুসরণ করা এবং শেষ ও উচ্চতম ভাবনা হল—দিব্য নীতি ও দিব্য প্রকৃতিতে নিজেকে উন্নীত করা।

এই প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথকেও স্মরণ করতে পারি।—কাছের পাওনাকে নিয়ে কামনার যা দুঃখ তা পশুর, দূরের বাসনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যা বেদনা তাই মানুষের।—এই ধরণের কথা তিনিও বলেছেন।

মানুষকে পশুভাবের থেকে মানুষীভাবের ভেতর দিয়ে দিব্যভাবে উন্নীত হতে হবে। তার অন্তঃপ্রকৃতি সেই লক্ষ্যের দিকেই তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে—অন্তরে বাইরে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। কোন্ স্মরণাতীত কাল থেকে এ যাত্রা সুরু হয়েছে মানুষের; অবমানব স্তর থেকে ক্রমশঃ উন্নীত হয়ে মানুষ আজ এই বিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বলতম সভ্যতায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। কিন্তু এখনও তার

চলার গতি থামেনি। ক্রমোন্নতির এই গতিধারা যদি আমরা একটু অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করতে চেষ্টা করি, তাহলেই আমরা বুঝতে পারি একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে মানুষ একটা উচ্চতর চেতনায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে। কিন্তু তার এই অগ্রগতি সহজ এবং সাবলীল নয়। তার সত্তার সঙ্গে নিগূঢ় হয়ে রয়েছে পরস্পর বিরোধী দুইটি প্রবেগের তীব্র আকর্ষণ-বিকর্ষণ। একটিতে সে ব্যক্তিগত মানুষ, অন্যটিতে সে সমাজগত। সে প্রথমে চায় তার নিজের কতকগুলি দাবীদাওয়া মেটাতে, কিন্তু তার উপরও সমাজের অনেক দাবীদাওয়া। সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে তার প্রকৃতি যখন ছিল দুরন্ত এবং আরও স্থূল, তখন তাকে সুস্থির করার জন্যে তার ব্যক্তিগত দাবীগুলোকে পরিশুদ্ধ করার জন্যে প্রয়োজন ছিল সমাজের নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু এখন সে সভ্য হয়ে উঠেছে, এখন সে চায় নিজেকে প্রসারিত করে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে। এখন যদি সমাজ তার স্থূল হস্ত অবলেপে মানুষের এই স্বাভাবিক বিকাশকে প্রতিহত করে, তাহলে সমাজ এবং ব্যক্তি—উভয়েরই অগ্রগতি হয় ব্যাহত। এই দুই পরস্পর বিরোধী প্রবেগ মানুষের সমস্ত কর্ম-প্রবণতার উপর খবরদারী করে বলেই তার অগ্রগতির পথ এমন আঁকাবাঁকা। পরস্পর বিরোধী এই দুইটি প্রবেগকে সুনিয়ন্ত্রিত করে, তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে সমাজ জীবনে নৈতিক আদর্শ গড়ে উঠেছে। মানুষের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে নীতি-বোধ। কিন্তু তবুও পারস্পরিক সংঘর্ষের অবসান ঘটানো সম্ভব হয়নি। বরং তা ক্রমশঃ আকারে প্রকারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এর অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ যে moral ideals বা নৈতিক আদর্শ আমরা গড়ে তুলেছি তার মধ্যে আত্মিক সত্যকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি এই জন্যে যে, আমাদের মনঃশক্তির সীমায় সে সত্য এখনও ধরা পড়েনি। তাছাড়া নৈতিক আদর্শের বিধানগুলো ক্রমশঃ এমন authoritative এবং dogmatic হয়ে

ওঠে যার ফলে সমাজ ও মানুষের অগ্রগতির পথে তারা হয়ে পড়ে বাধাস্বরূপ। তাই এক যুগের সামাজিক বিধান অন্যযুগে অচল হয়ে পড়ে। স্বাভাবিক কারণেই মানুষ আর তা মানতে চায় না। তখন মানুষই আবার নূতন বিধান, নূতন রীতি-নীতি সব প্রণয়ন করে, কালক্রমে আবার তারও প্রভাব যায় কমে।

গোষ্ঠীগত মানুষ আর তার ছোট্ট পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ নেই। ছোট্ট পরিবারের সংকীর্ণ সীমা পেরিয়ে কুল, বংশ, উপজাতি, সম্প্রদায় ইত্যাদির বেড়া ডিঙিয়ে 'নেশনে'র মধ্যে সে সম্প্রসারিত করেছে তার গোষ্ঠীগত পরিচয়কে। কিন্তু ভবিষ্যতে সে 'নেশনে'র মধ্যেও আবদ্ধ থাকবে না; বিশ্ববোধে সে উদ্বোধিত হবে, তার পরিচয় হবে যে, সে বিশ্বজনীন মানুষ। সুতরাং কোন বাঁধা নিয়ম-কানুনের মধ্যে তাকে আবদ্ধ করে রাখা সম্ভব নয়। অথচ বাইরের বিধি-বিধানের সাহায্যেই তাকে ঐক্যবদ্ধ করবার চেষ্টা চলেছে। এ চেষ্টা যখন ব্যর্থ হবে, তখন মানুষ নূতন পথের সন্ধানে ফিরবে। এই ভাবেই এগিয়ে চলেছে মানুষ—নানারকম পরস্পর বিরোধী ভাবনার পারস্পরিক সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে পথ করতে করতে। বাইরের জীবনে মানুষের এই যে অগ্রগতি এর থেকে একটি সত্যই উদ্‌ঘাটিত যে, মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি ভেতর থেকে এমন তীব্র আকুতির সৃষ্টি করছে যে, বাইরের জীবনে মানুষ স্থির থাকতে পারছে না। নূতন নূতন পথের সন্ধানে দিশাহারা হয়ে ছুটোছুটি করছে। উন্নততর চেতনার অবতরণের জন্য নীচের থেকে প্রয়োজন এই তীব্র আকুতির।

বহির্জীবনে মানুষ যে ভাবে এগিয়ে চলেছে অন্তর্জীবনের অগ্রগতি অর্থাৎ প্রসার কিন্তু তদনুযায়ী ঘটছে না। প্রাকৃত জীবনের রহস্য সন্ধানে মানুষ আজ অনেক অগ্রসর। বুদ্ধির সাহায্যে জড়-প্রকৃতিকে নানা ভাবে বশীভূত করতে এবং তাকে নিজের প্রয়োজনে নিয়োগ করতে আগের চেয়ে মানুষ অনেক বেশী সক্ষম। বাইরের

জীবনের এই বৃদ্ধি মানুষকে আজ এমন শক্তিশালী করে তুলেছে যে তার সঙ্গে সমানভাবে অন্তর্জীবনের প্রসার না ঘটলে, মানুষ, তার বুদ্ধি বলে আহৃত শক্তির সাহায্যে নিজেকেই ধ্বংস করবে। এই জন্যেই বলা হয়েছে "without an inner change man can no longer cope with the gigantic development of the outer life".[১]

জড় বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হওয়ায় আমরা দেখছি মানুষ প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হয়েছে। বহুতর পার্থিব সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তার জাতিগত অহং এর প্রসার ঘটেনি। তার মধ্যে বিশ্ববোধ জেগে ওঠেনি। এবং সেই জন্যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষ বেড়েই চলেছে। সামঞ্জস্য ও সমতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হচ্ছে না। রাষ্ট্রের নির্দেশে মানুষের বুদ্ধি মারণাস্ত্র আবিষ্কারে নিয়োজিত। যে শক্তি মানুষকে আরও উন্নততর অবস্থায় তুলে ধরতে পারত, সেই শক্তি মারাত্মক যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণেই ব্যস্ত। বিজ্ঞান অর্থাৎ সায়েন্সের সহায়তায় বাইরের জীবনে মানুষ আজ অনেক উন্নত স্তরে উঠতে পেরেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তার অন্তর্জীবনকেও যদি সে উন্নত করতে পারত তাহলে তার জাতিগত 'অহং' কবে ঘুচে যেত। বাইরের উন্নতি অন্তর্জীবনকে সমানভাবে উন্নত করতে পারেনি বলেই Atomকে সে ধ্বংসের দানবে পরিণত করেছে। যা হতে পারত নব নব শক্তির পরম স্রষ্টা, তা হয়ে গেল প্রলয়ংকর যুদ্ধের মারণ আয়ুধ। সেই জন্যেই বলা হয়েছে অন্তর্জীবনের পরিবর্তন সাধন না করতে পারলে অর্থাৎ উচ্চতর চেতনায় মানুষ উন্নীত না হলে নিজের অস্ত্রে মানবজাতি নিজেই বিনষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথেরও ছিল এই উদ্বেগ—"ভেবে না পাই কে বাঁচাবে আপন-হানা অন্ধ মানুষেরে।"

---

(১) P. B. Sain Hilaire সম্পাদিত Sri Aurobindo The Future Evolution of Man গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আমরা যখন বাড়ী তৈরী করাই তখন আগের থেকে স্থির করে নিই,—বাড়ী কত উঁচু হবে। অর্থাৎ দোতলা, তিনতলা না তার চেয়েও বেশী। এখনই যে হবে তা নয়, ভবিষ্যতে যদি কোনও দিনও হয় তাহলেও, গোড়া থেকেই সেটা ভেবে নিই,—কেননা, তদনুযায়ী ভিত দিতে হবে এবং গাঁথুনি মজবুত করতে হবে। একতলার ভিতে পাঁচতলা বাড়িকে দাঁড় করানো সম্ভব নয়। অথচ মানুষের বেলায় আমরা একবারও ভাবি না যে, ভবিষ্যতে মানুষ কি হবে। আজ সে যেমন মানুষ আছে আগামী দিনেও অর্থাৎ নিকট কিংবা সুদূর ভবিষ্যতেও সে ঠিক তেমনি 'মানুষ'ই থাকবে একথা ভেবে নিয়েই আমরা রীতি-নীতি, বিধিবিধান সব প্রবর্তন করি এবং ভাবি যে, মানুষ যদি এই সব রীতি-নীতি অনুসরণ করে চলে তাহলেই সমাজ সুখী এবং সমৃদ্ধ হবে। ভবিষ্যতে মানুষ কি হবে এধারণা যদি আমরা না করতে পারি তাহলে যতই আইন কানুন প্রয়োগ করি না কেন তা কখনই সফল হবেনা। তাছাড়া মানুষের জীবনটা Iceberg এর মত। Surface-এ যা দেখা যায় তা হল সমগ্রের এক দশমাংশ মাত্র, বাকী ন'ভাগ জলের তলায় লুকানো। সুতরাং বহির্জীবনই মানুষের যথার্থ পরিচয় নয়। অন্তর্জীবনের রহস্যকেও ভাল করে জানার প্রয়োজন। বাইরের ঐটুকু জ্ঞান নিয়ে গোটা মানুষ সম্বন্ধে মন্তব্য করা কখনই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। অথচ আমরা সেই চেষ্টাই করছি। যার মধ্যে ঘটবে অসীমের পরম প্রকাশ, তাকে বার বার সীমার বাঁধনেই বাঁধতে চাইছি। ভবিষ্যতে যে বাড়ী হবে আকাশচুম্বী, একতালার ভিত দিয়ে তাকে খাড়া করবার বৃথা চেষ্টা করছি। আমাদের এই প্রয়াস যতই ঐকান্তিক হোক না কেন, বার বার ব্যর্থ হচ্ছে তবুও আমরা সঠিক পথের সন্ধান করতে পারছি না। কেননা আমাদের বুদ্ধি—বাইরের জীবনকেই জানে বা জানার শক্তি তার আছে। অন্তর্জীবনকে জানা তার সাধ্য নয়। অথচ এই অন্ত-

জীবনের রহস্য যদি আবিষ্কার না করা যায় তাহলে পরবর্তী উন্নততর অবস্থায় মানুষ কি করে উন্নীত হবে! শুধু বাইরের জীবনের পরিবর্তন ঘটালেই তো হবে না, অন্তর্জীবনের রূপান্তর ঘটাতে হবে। অর্থনৈতিক কাঠামো এবং উৎপাদন ব্যবস্থার রীতি-নীতি বদলালেই মানুষ চরম উৎকর্ষ লাভ করবে—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে বাইরের থেকে আমরা যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করি না কেন পরিণামে তা ব্যর্থ হবেই। Inner change ঘটাতে গেলে Inner lifeকে অবশ্যই জানতে হবে। তা না হলে আপনহানা অন্ধ মানুষকে কেউ আর রক্ষা করতে পারবে না। সেই জন্যই বলা হয়েছে,—"If humanity is to survive a radical transformation of human nature is indispensable."[১] মানুষকে যদি বাঁচতেই হয় তাহলে অবশ্যই তার অন্তঃপ্রকৃতির রূপান্তর ঘটাতে হবে।

কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব ?

শ্রীঅরবিন্দ তারও সন্ধান দিয়েছেন। সে কথা পরে আলোচিত হবে। এতক্ষণ যা বলা হল তার বিরুদ্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে অনেকে হয়ত বলবেন পশ্চিমী জড়বাদী দার্শনিকেরা, যে-সব তত্ত্ব প্রচার করেছেন, তা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। তাঁরা যুক্তি-বুদ্ধি-গ্রাহ্য তত্ত্বকেই সত্য অর্থাৎ Real বলেই ধরে নেন। এবং যা যুক্তি-বুদ্ধিতে ধরা যায় না তাকেই তাঁরা বলেছেন—Unreal ; তাঁদের মত হল, --whatever is real is rational and whatever is rational is real. অথচ আমাদের মত হল,—সত্য যা তা মনো-বুদ্ধির অগোচর। এই অতীন্দ্রিয় তত্ত্বকে ওঁরা Realistic বলেন না, বলেন Idealistic. তাই জড়জীবনের উন্নতির জন্যে তাঁরা Idealistic বা ভাববাদী কোনও তত্ত্বের উপর নির্ভর করে কোনও মতবাদ গড়ে তুলতে চাননা। কেননা তাঁরা জানেন ভাববাদী তত্ত্ব বায়ুতে সঞ্চরণশীল। পৃথিবীর কঠিন মাটির সঙ্গে তার কোনও

---

[১] P. B. Sain Hilaire সম্পাদিত Sri Aurobindo — The Future Evolution of Man গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই। আমরা যে বলেছি—without an inner-change man can no longer cope with the problems of his outer life,—অতীন্দ্রিয় কোনও তত্ত্বের সাহায্যে এই Inner change কি সম্ভব? বাইরের পরিবেশ, শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থ-নৈতিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই তো মানুষের অন্তরের পরিবর্তন আপনা থেকেই ঘটবে।

—কিন্তু তাই কি ঘটেছে? বাইরের জীবনের উন্নতির সঙ্গে অন্তর্জীবনের প্রসার ঘটেনি। আমরা তো আগেই বলেছি যে, বাইরের কোনও বিধি-বিধানের সাহায্যে অথবা অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক কিংবা সমাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাহায্যেও মানুষের অন্তর্জীবনের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। কেননা— Man is not a political animal,—inspite of Aristotle —nor is he an economic animal—inspite of Marx and Engels.[১] এর জন্যে উচ্চতর চেতনায় মানুষকে উন্নীত হতেই হবে। অতীন্দ্রিয় কোনও তত্ত্বের সাহায্যে কিংবা অন্য কোনও উপায়ে সেই রূপান্তর সংসাধিত হবে কিনা সেটা পরে বিবেচনা করে দেখা যাবে।—প্রকৃতপক্ষে সেইটাই হল আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়; এখন শুধু আমরা জানলাম যে, মানুষের অন্তর্জীবনের পরিবর্তন প্রয়োজন, কেননা, তা না হলে মানুষ আর নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

পশ্চিমী দার্শনিকদের মধ্যে যদি কেউ কেউ মনে করেন বুদ্ধির সাহায্যেই আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির সবকিছু রহস্যই জানা সম্ভব এবং তা যদি না জানা যায় তাহলে তাকে Unreal বলে নস্যাৎ করাই বিধেয়, তাহলে আমরা আর কি করতে পারি। বুদ্ধির গোচরে আজ যাকে ধরা গেলনা ভবিষ্যতে যে কোনও দিনই তাকে ধরা যাবে না এমন কথা জোর করে কি বলা যায়? অথচ তাঁরা তাই বলেন।

[১] Sri Nolinikanto Gupta- Editorial- Advent. 1945.

বলেন যা জানা গেল না তাই Unknowable। আমরা বলি তা নয়, বর্তমানে সেটা Unknown কিন্তু Unknowable কখনই নয়। The Unknown is not the Unknowable, it need not remain the Unknown for us, unless we chose ignorance or persist in our first limitations. For to all things that are not unknowable, all things in the Universe, there correspond in that Universe faculties which take cognisance of them, and in man the microcosm, these faculties are always existent and at a certain stage capable of development.

[The Life Divine-Chap II]

চিন্তার দিক থেকেই আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে এক মৌল প্রভেদ। আমাদের সাধনা ভেতর থেকে বাইরে। ওদের সাধনা বাইরের থেকে ভেতরে। আমাদের গতি কেন্দ্রের থেকে পরিধির দিকে। যেভাবেই যাই না কেন পরিধিতে উপস্থিত আমরা হবই ; কিন্তু ওদের গতি পরিধির থেকে কেন্দ্রের দিকে। পথ একটু ভুল হলে কেন্দ্রে পৌঁছানো আর সম্ভব হয় না। কেন্দ্র তখন অজ্ঞেয় হয়েই থাকে। পরিপূর্ণ সত্যের আলোয় আমরা বস্তুর পরিচয় পাই, ওরা বস্তুর মধ্যে বিধৃত খণ্ডিত সত্যকে পেয়ে পূর্ণ সত্যকে জানতে চায়। দৃষ্টিভঙ্গীতে যখন এত প্রভেদ, তখন তত্ত্বের মধ্যেও প্রভেদ থাকবে বৈকি। আর যে ভাববাদী আদর্শের কথা উত্থাপিত হয়েছে, সে সম্বন্ধেও অনেক কিছু বলার আছে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Ideals and Progress নামক ছোট্ট গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদভাবে অনেক আলোচনা করেছেন। মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে এই তত্ত্বটি সংশ্লিষ্ট নয় বলে, এ-বিষয় নিয়ে এখানে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে চাই না। সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলা যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে পাঠকদের অনুরোধ করা যেতে পারে মূল বইখানা একবার ভাল করে পড়ে নেবার জন্যে।

আমাদের জড়জীবনের স্তরে যে সত্য এখনও প্রতিফলিত হয়নি, অনাগত ভবিষ্যতে যার প্রতিফলন সম্ভব হবে, সেই সত্য সৃজনশীল মানুষের অন্তরে যখন প্রতিভাত হয় তখনই তাকে Ideal রূপে মানুষ গ্রহণ করে। সেই Ideal কে সামনে রেখে মানুষ এগিয়ে চলে। একথা অবশ্যই সত্য যে, Ideals are not the Ultimate Reality. কেননা যে স্তরে পরম সত্যের অধিষ্ঠান, Ideal এর সীমায় সে স্তরের আভাসটুকুও ধরা দেয়না। তবে Ideal হল পার্থিব চেতনায় নিক্ষিপ্ত পরম সত্যের কিছু ভাব, যার উপর ভিত্তি করে পার্থিব শক্তির ক্রিয়াশীলতা গড়ে উঠতে পারে।

কর্মসম্পাদন করাই যাঁদের কাজ অর্থাৎ যাঁদের বলা হয় Executive, তাঁরা Idealist না হতেও পারেন, কিন্তু যাঁরা সৃজনশীল অর্থাৎ creative তাঁদের Idealist হতে হয়। যাঁরা বাস্তব ধর্মী অর্থাৎ যাঁদের বলা হয় pragmatic, তাঁরা সেই তত্ত্বই গ্রহণ করেন,— যাকে বুদ্ধির সাহায্যে উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই তাঁরা Idealist দের ভাল চোখে দেখেন না। কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে কোনও তত্ত্বকে জানার পূর্বেই যদি সে তত্ত্ব মানুষের চিন্তার রাজ্যে ধরা দেয় এবং তদনুযায়ী মানুষ যদি তার কর্মপদ্ধতি নিরূপণ করেন তাহলে মানুষের অগ্রগতি যে দ্রুততর হতে পারে—এ সম্বন্ধে বোধ করি কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না।

বিবর্তনের ধারাটি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, The animal is executive and not creative. পশু হল জড় ও জীবনের এমন যন্ত্র যার নিজের চলার কোনও ক্ষমতা নেই। কেননা, চিন্তা অথবা মননশীলতার সাহায্যে কোনও কিছু উদ্ভাবন করে আপন জীবনে তাকে প্রতিফলিত করা পশুর সাধ্য নয়; বর্তমানই তার সব, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার কোনও মাথাব্যথা নেই। যে পরিবেশে সে গড়ে ওঠে তার চেয়ে ভিন্নতর কোনও পরিবেশ আছে কিনা, তা জানবার কোনও শক্তিরই সে অধিকারী নয়। সেই

কারণেই সে executive হয়ে রয়েছে creative হতে পারেনি ; কিন্তু মানুষ মননশীল। স্বতঃই সে সৃজনশীল। কিন্তু শুধু Idealist হয়ে থাকলে চলবে না, মানুষকে pragmatist'ও হতে হবে। কেননা,—Man approaches nearer his perfection when he combines in himself the idealist and the pragmatist, the orgainative soul and the executive power.

দুঃসাধ্য সাধন করার জন্য যে সব শক্তিধর মানুষ এই পৃথিবীতে জন্মেছেন তাঁদের মধ্যেও দেখা গিয়েছে এই দুইটি,—আপাতঃ বিচারে পরস্পর বিরোধী,—প্রবণতার অপূর্ব সমন্বয়। তাই তাঁদের কর্মের মধ্যে দেখা যায় আদর্শের আশ্চর্য প্রতিফলন। তাঁরা চিন্তাশীল কর্মী এবং Practical dreamers. এমনিই মানুষ ছিলেন নেপোলিয়ন এবং আলেকজাণ্ডার। নেপোলিয়ন, মুখে অবশ্য, যাঁরা আদর্শবাদী, যাঁরা স্বপ্ন দেখেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সব সময়ে সোচ্চার ছিলেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি নিজে ছিলেন অতিমাত্রায় স্বপ্ন দ্রষ্টা এবং অবিচল আদর্শবাদী। হয়তো তিনি তা জানতেন না। যাই হোক, মানুষের মধ্যে যদি Idealism এবং Pragmatism এর সমন্বয় ঘটে, তাহলে মানুষের অগ্রগতির বেগ দ্রুততর হয়। সুতরাং ভাববাদীরা যে নিন্দার্হ এ কথা কখনই বলা চলে না।

এ প্রসঙ্গ এখন থাক, আমাদের মুল প্রশ্নে আবার আমরা ফিরে আসি। আমাদের প্রশ্ন ছিল শ্রীঅরবিন্দকে মহাবিপ্লবী বলা যায় কিনা।

এই প্রশ্নটির সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে আমাদের বিচার করে দেখতে হবে বিপ্লব বলতে আমরা কি বুঝি।

সাধারণ ভাবে আমরা জানি Evolutionকে ত্বরান্বিত করার নাম Revolution.

এখন তাহলে প্রথমে evolution এর তত্ত্বটিকে ভাল করে বোঝা দরকার। তারও আগে বোঝা দরকার Involution অর্থাৎ সংবৃতির

তত্ত্বটি। যে অবস্থার থেকে বিবর্তনের কাজ সুরু হল সেই অবস্থাটি কেন এবং কি ভাবে গড়ে উঠল তা যদি আমরা না জানি, তাহলে বিবর্তনের তত্ত্বটিকে সঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। সুতরাং Involution এর তত্ত্বটি আমাদের সর্বাগ্রে জানতে হবে। এতক্ষণ evolution সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু Involution সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি। এই সংবৃতির তত্ত্বের সঙ্গে বৈদিক ও ঔপনিষদিক চিন্তাধারা গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট; কিন্তু Revolution এই শব্দটির থেকেই বুঝতে পারা যায় যে ওর মধ্যে পশ্চিমী ভাবনাই বিধৃত। বাস্তবিক পক্ষে Involution এর তত্ত্বটি পশ্চিমী মনীষীরা বিশেষ করে জড়বাদী দার্শনিকেরা একেবারেই গ্রহণ করেননি। এবং সেই জন্যেই evolution এর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁরা একদিকে যেমন 'Missing LINK' এই কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন, অন্যদিকে মানুষের পর কি, তা আর তাঁদের মাথায় আসছেনা। গোড়াতেই Involution এর তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করলে বিষয়টি দুরূহ হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় আমরা Evolution সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করেছিলাম। এবং ঐ তত্ত্বটি সম্বন্ধে আরও দু'চারটি কথা বলার পর আমরা Involution সম্বন্ধে আলোচনা করব।

Evolution এর তত্ত্ব থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, মানবজাতিকে বেঁচে বর্তে থাকতে হলে তার স্বভাবের রূপান্তর ঘটাতে হবে। এটা হল বিবর্তনের একটা দিক। অন্যদিক মানুষের বহির্জীবনের পরিবর্তন। জীবনের এই দিকটাতেই 'বিপ্লব' কথাটির বহুল ব্যবহার অর্থাৎ অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে, নূতন সমাজ ও নূতন রাষ্ট্র গঠন করে নূতন অর্থনৈতিক ও উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে মানুষকে দ্রুত সুখী ও সমৃদ্ধ করে তুলতে হলে যে উপায় মানুষকে অবলম্বন করতে হয় তারই নাম হল বিপ্লব। যেমন শিল্প বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব ইত্যাদি।

এবং এই অর্থেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর স্বল্প পরিসর রাজনৈতিক জীবনে ছিলেন বিপ্লবী। কেননা ইংরাজের অত্যাচারী শাসন ও শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করে তিনি চেয়েছিলেন দেশের মানুষকে সুখী ও সমৃদ্ধ করে তুলতে। কিন্তু পরবর্তীকালে যে জীবন তিনি বরণ করে নিলেন, সে-জীবন, বিপ্লব যে অর্থে ব্যবহৃত, তার থেকে অনেক দূরে। সুতরাং ১৯০৫—১০ সালের শ্রীঅরবিন্দকে যদিও বা বিপ্লবী বলা যায়, পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দকে নৈব নৈব চ। —এই হল সাধারণ মানুষের ধারণা। কেন না, ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান থেকে যথাপ্রয়োজন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে মনুষ্য সমাজকে উন্নততর অবস্থার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবাব জন্য মানুষ যে সব বৈপ্লবিক কর্মপন্থা গ্রহণ করে, তার মধ্যে অন্তঃপ্রকৃতির পরিবর্তন সাধনের কোনও কার্যক্রম অর্থাৎ programme নেই। না থাকবারই কথা। কেন না, পশ্চিমের মানুয়, যাঁরা জড়বাদী দর্শনের প্রবক্তা বা অনুরাগী, তাঁরা অন্তঃপ্রকৃতির রহস্য হৃদয়ঙ্গম করবার শক্তি আয়ত্ত করার কোনও চেষ্টাই করেন নি! তাই তাকে অস্বীকার করেই তাঁরা এগোতে চান। এবং তাঁদের চিন্তা চেতনা, ধ্যান ধারণার দ্বারা যেহেতু আমরা এ দেশের বুদ্ধিবাদী আধুনিক মানুষ বিশেষ ভাবে প্রভাবিত, সেই হেতু অন্তঃপ্রকৃতির প্রকৃত মুল্যায়নে আমাদেরও যথেষ্ট অনীহা এবং সেই হেতু শ্রীঅরবিন্দের জীবনব্যাপী এই দুরূহ তপস্যাকে যে বৈপ্লবিক আখ্যা দেওয়া যায় সে ধারণাও আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি।

বুদ্ধি পরিচালিত কর্মানুশীলনের সাহায্যেই পরিবর্তন সাধন সম্ভব —এই ধারণাই আমাদের মনে বদ্ধমূল। তপস্যার শক্তিকে আমরা অবশ্য পশ্চিমী মানুষদের মত পুরোপুরি নস্যাৎ করে দিতে পারি না, তবুও তাকে বৈপ্লবিক বলতে গিয়ে কেমন যেন খটকা লাগে। তপস্যার সঙ্গে যেহেতু ঐশ্বরিক ভাবনা একান্ত ভাবে সংশ্লিষ্ট এবং যেহেতু ঈশ্বর নামক বস্তুটি সমাজে সুবিধাভোগী শ্রেণীদের দ্বারা সৃষ্ট, সেই হেতু

তপস্যার সাহায্যে বিপ্লব সাধন কথাগুলো শুনলেই যেন সন্দেহ জাগে। তাই বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দকে ১৯০৫—১০ সালের মধ্যে আবদ্ধ রেখে আমরা নিশ্চিন্ত হই।

যাইহোক আমাদের এখন বিচার করে দেখতে হবে বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করার জন্যে শ্রীঅরবিন্দ কি চেষ্টা করেছিলেন। বিবর্তন-ধারার ক্রমগতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বলেছি,—মানুষ আজ যেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে তার থেকে উন্নততর অবস্থায় উঠতে না পারলে সমাজ ও মানুষকে ঘিরে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে তার সমাধান সম্ভব নয়। আমরা এ কথাও বলেছি,—বাইরের জীবনের পরিবর্তন সাধন করে অন্তর্জীবনকে পরিবর্তন করা যাবে না। অন্তঃপ্রকৃতির রহস্য না জানতে পারলে, মানুষের পক্ষে এমন কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব নয় যার সাহায্যে অন্তর্জীবনের পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। সুতরাং আমাদের এখন বিচার করে দেখতে হবে যে, উচ্চতর চেতনায় মানুষকে উন্নীত করা এবং উচ্চতর চেতনাকে পার্থিব চেতনায় নামিয়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে শ্রীঅরবিন্দ কি চেষ্টা করেছিলেন।

আমরা জানি যে, অধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধ বহু ঋষি, সাধক ও মহা-পুরুষ এই ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর অন্যত্র জন্মগ্রহণ করেছেন। এমন কি শ্রীকৃষ্ণ, যিনি স্বয়ং ভগবান তাঁকেও এখানে অবতীর্ণ হতে হয়ে-ছিল। কিন্তু তবুও মানুষের দুর্দশা আজও ঘুচল না। মানুষ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেল। সুতরাং আমাদের প্রশ্ন হল, ঐ অধ্যাত্ম সাধনার পথে কি বিপ্লব আনা সম্ভব? শ্রীঅরবিন্দ কি কোনও নূতন পথের সন্ধান দিয়েছেন? যে কাজ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ করতে পারেননি—সেই কাজ সম্পন্ন করতে শ্রীঅরবিন্দ সাহসী হলেন কি করে?

প্রশ্নটি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। যথাসময়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

এই আলোচনার সুরুতে চেতনার ক্রমোন্মীলনের প্রসঙ্গে আমরা

বলেছিলাম,—পরমচেতনা অর্থাৎ Supreme Consciousness অথাৎ ব্রহ্ম, জড়ের মধ্যে আবরিত ছিল, ক্রমশঃ তার উন্মীলন ঘটছে। এই ভাবে মানুষে এসে উন্মীলিত হয়েছে মনশ্চেতনা। এখন

Supreme Consciousness অথাৎ 'পরমচেতনা' জড়ের মধ্যে আবরিত ছিল কিনা তা জানতে গেলে সংবৃতি অর্থাৎ Involution এর তত্ত্বটি জানতে হয়। একটু আগেই আমরা বলেছি Involution হল Evolution এর গোড়ার কথা। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—An Involution of the Divine Existence, the spiritual reality in the apparent inconscience of Matter is the starting point of the evolutiou...the evolution must then be an emergence of the Existence, Consciousness, Delight of Existence.

সংবৃতি অর্থাৎ Involution এর তত্ত্ব থেকে আমরা জানতে পারি জড়ের আপাতঃ নিশ্চেতনার মধ্যে নিগূঢ় হয়ে আছে যে শক্তি তাই হল—Divine Existence অর্থাৎ দিব্য সৎস্বরূপ। যাকে আমরা বলেছি পরমচেতনা। সৎ, চিৎ এবং আনন্দই হল সেই সত্যবস্তুর শাশ্বত স্বরূপ। সুতরাং অভিব্যক্তিবাদের পথে এই শক্তিরই উন্মীলন অর্থাৎ প্রকাশ ঘটবে।

এই হল সংবৃতি (Involution) ও বিবৃতি (Evolution) তত্ত্বের মৌল বক্তব্য। কিন্তু আরও একটু বিশদভাবে আলোচনা না করলে, বিষয়টির রহস্য আমাদের কাছে স্বচ্ছ হ'য়ে উঠবেনা। যদিও তত্ত্বটি খুবই দুরূহ, তবুও যথাসম্ভব সহজভাবে—আলোচনা করে তত্ত্বটি বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

আমরা আগেই বলেছি পৃথিবীতে সবই ছিল Matter। তার থেকে এল উদ্ভিদ, এল প্রাণী, এল মানুষ। কিন্তু এ হল ঘটনার বিবরণ। এর থেকে ঘটনার কারণ কি তা' অনুধাবন করা যায় না। আমরা যদি বলি চলন্ত ট্রেণের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি মেয়ে

আত্মহত্যা করল, তাহলে আমাদের এই উক্তি থেকে মেয়েটীর আত্মহত্যার হেতু কি তা' নির্ধারণ করা যাবে না। সুতরাং আমাদের জানতে হবে, Matter থেকে কেন উদ্ভিদ এল, কেন প্রাণী এল এবং কেনই বা এল মানুষ। অর্থাৎ এক কথায় আমাদের জানতে হবে Matter এর স্বরূপ কি !

উদ্ভিদের মধ্যে যে চেতনা স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছে সেই চেতনা যদি Matter এর মধ্যে নিগূঢ় হয়ে না থাকত তাহলে উদ্ভিদের মধ্যে সে চেতনার বিকাশ ঘটল কি করে ! আবার প্রাণীর মধ্যে বহির্মুখী যে জাগ্রত চেতনা অভিব্যক্ত (manifested) হয়েছে সে-চেতনা নিশ্চয়ই উদ্ভিদের মধ্যে তথা Matter এর মধ্যে আবরিত হয়েছিল। এবং মানুষের মধ্যে যে-অন্তর্মুখী মনশ্চেতনার বিকাশ ঘটেছে সে-চেতনাও নিশ্চয়ই প্রাণীর মধ্যে—তথা Matter এর মধ্যেই নিগূঢ় হয়েছিল। কেননা, যা নেই তার থেকে তো কিছু উদ্ভূত হতে পারেনা Ex Nihilo-Nihil—অর্থাৎ নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ। কিংবা যা আছে তার থেকে সেই জিনিনই উদ্ভূত হয়। যেমন দুধের মধ্যে দইয়ের সম্ভাবনা আছে বলেই—দুধ থেকে দই হয়—সরষের তেল থেকে হয়না ! সেই রকম—Matter এর মধ্যে প্রাণচেতনা, মন-চেতনা নিশ্চয়ই আবরিত ছিল, ক্রমোন্মীলনের ধারায় (Process of unfolding of Consciousness) একটির পর একটি একটি পর্ব বিকশিত অর্থাৎ অভিব্যক্ত হচ্ছে।

কিন্তু Matter এর মধ্যে এই চেতনা সব এল কোথা থেকে ? এই প্রশ্নের জবাব—Physics দিতে পারে না, Botany পারেনা, Biology পারেনা, পারেনা Psychology'ও। এর উত্তর আমরা পেয়েছি উপনিষদের কাছ থেকে। এবং উপনিষদের সেই তত্ত্বটি আরও বিশদ করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন শ্রীঅরবিন্দ।

তাঁর The Life Divine গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে (Book I-Chap XXIV) Matter সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

অধ্যায়টির শিরোনামও তাই Matter. এই অধ্যায়টির সূচনায়—তৈত্তিরীয় উপনিষদ থেকে একটি উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছেন তিনি। একটি মাত্র বাক্য—He arrived at the knowledge that Matter is Brahman." বরুণ পুত্র ভৃগু একদিন বরুণকে বললেন, বাবা, আমি ব্রহ্ম সম্বন্ধে জানতে চাই। বরুণ বললেন,—তুমি তপস্যা কর, তপস্যার সাহায্যে ব্রহ্ম-তত্ত্ব জানতে পারবে। ভৃগু তপস্যা করলেন—। "স তপস্তপ্ত্বা অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে." তিনি তপস্যার সাহায্যে জানলেন অন্নই ব্রহ্ম। অন্ন থেকেই সবকিছু উদ্ভূত।" [তৈত্তিরীয়োপনিষৎ-৩।২]

কিন্তু Matter-ই ব্রহ্মের স্বরূপ নয়। ব্রহ্ম এক, একমেবাদ্বিতীয়ম্। তিনি বহু হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বহু হয়ে এই বিশ্বজগতে [অপরার্ধে] নেমে এসেছেন। এবং নিজেকে হারিয়ে Matter-এ পরিণত হয়েছেন—। Involution তত্ত্বে ব্রহ্মের Matter-এ পরিণত হওয়ার কথাই বিস্তৃত ভাবে বলা হয়েছে। এবং Evolution-তত্ত্বে বলা হয়েছে, -"নিজেরে হারায়ে খুঁজি"। অর্থাৎ যে-পরম চেতনা (Supreme Consciousness)Matter এর মধ্যে গুপ্ত ও সুপ্ত হয়েছিল, সেই হারিয়ে যাওয়া চেতনাকে খুঁজতে খুঁজতে বিবর্তনের ধারায় প্রাণচেতনা ও মনশ্চেতনা বিকশিত হয়েছে। উন্মীলনের ধারা এখনও থামেনি। উন্নততর চেতনা এখনও বিকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ সেই তত্ত্বই আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

—কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এ-তত্ত্ব সব জানলেন কোথা থেকে ?

আগেই বলা হয়েছে,—জেনেছেন উপনিষদ থেকে, জেনেছেন আত্মোপলব্ধির সাহায্যে। আমরা জানি যে, বৌদ্ধ, জৈন ও চার্বাক দর্শন ছাড়া আমাদের সব কটি দর্শনকেই বলা হয় আস্তিক দর্শন। কেননা সব কটি দর্শনই বেদ ও উপনিষদে স্বীকৃত ঈশ্বরকে স্বীকার করেই রচিত হয়েছে। সেই হিসাবে শ্রীঅরবিন্দের দর্শনকেও বলা

যেতে পারে আস্তিক দর্শন। অবশ্য অধ্যাত্মজীবন ও পরমচেতনার তত্ত্ব নিয়ে যে সব প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন তাকে যদি দর্শন হিসাবে আমরা গ্রহণ করি। শ্রীঅরবিন্দ নিজেকে ঠিক দার্শনিক বলতেন না। কিন্তু তাঁর রচনাগুলো যে আপনা থেকেই দর্শনে পরিণত হয়েছে একথা তিনি জানতেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীদিলীপ কুমার রায়কে যে চিঠিখানি দিয়েছিলেন তার থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে,—because I had only to write down in the terms of intellect all that I had observed and come to know in practising yoga daily and the philosophy was there automatically, but that is not being a philospher!

প্রত্যহ যোগসাধনার সাহায্যে তিনি যে সত্য উপলব্ধি করতেন,—তাই বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাষায় প্রকাশ করতেন আর্য পত্রিকায়। সুতরাং যে তত্ত্ব সেখানে বিধৃত, তা সবই হল তাঁর কঠোর সাধনায় উপলব্ধ সত্য। সেই জন্যই সেই রচনাগুলো আপনা থেকেই 'দর্শন' হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া তিনি যখন এই সব প্রবন্ধগুলো রচনা করতেন তখন তাঁর মনোবুদ্ধি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকত। সুতরাং ঐ সব তত্ত্বে বুদ্ধির রঙ মিশে যায়নি। তাই উপলব্ধির বিকৃতি ঘটবার কোনও অবকাশ সেখানে ছিল না। বৈদিক ঋষিরা যেমন সাক্ষাদ্দর্শন কিংবা অপরোক্ষানুভূতির সাহায্যে যে সব সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন শ্রুতিতে তাই ব্যক্ত করেছেন, শ্রীঅরবিন্দও ঠিক তেমনি ভাবেই যা'কিছু জেনেছেন, ভাষায় রূপান্তরিত করে তাকে প্রকাশ করেছেন আর্য পত্রিকায়। আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, বেদ অধ্যয়নের আগে শ্রীঅরবিন্দের যে সব উপলব্ধি হয়েছিল, বেদ অধ্যয়ন কালে তিনি দেখলেন, সেই সব তত্ত্বই সেখানে সুন্দর ভাবে বিবৃত করা হয়েছে।

আপনারা যাঁরা The Life Divine পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই

লক্ষ্য করেছেন যে, প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতেই, বেদ, উপনিষদ, গীতা ইত্যাদি গ্রন্থের থেকে উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সম্পূর্ণ অধ্যায়টি যেন সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতিরই বিশদ ব্যাখ্যা। সুতরাং শ্রীঅরবিন্দের দর্শনকে বেদ ও উপনিষদের উপসংহার বললে বোধকরি অত্যুক্তি হবে না।

সে যাই হোক, এখন সংবৃতির তত্ত্বে ফিরে আসা যাক। আমি বলেছি সংবৃতির তত্ত্ব উপনিষদে আছে। শ্রীঅরবিন্দ তাকে বিশদ-ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর The Life Divine গ্রন্থে—Book II, Part II, The progress to knowledge –God —Man and Nature শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়ে।

মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে—

তপসা চীয়তে ব্রহ্মা ততোঽন্নমভিজায়তে।

অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্॥

তপঃশক্তিতে ব্রহ্ম ঘনীভূত হন। তার থেকে উদ্ভূত হল অন্ন, অর্থাৎ জড়, অর্থাৎ matter, এবং অন্নের থেকে প্রাণ ও মন ও লোক সমূহ জাত হয়। আবার তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে— তি'ন ইচ্ছা করলেন বহুরূপে আমি জাত হব। তপঃশক্তির সাহায্যে তিনি কেন্দ্রীভূত হলেন এবং তপঃশক্তির দ্বারা বিশ্বসৃষ্টি করলেন। সৃষ্টি করে তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হলেন—অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তিনি সৎ ও তৎ, অর্থাৎ মূর্ত ও অমূর্ত, সবিশেষ ও নির্বিশেষ, আশ্রিত ও অনাশ্রিত, চেতন ও অচেতন, সত্য ও অসত্য, যা কিছু আছে সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম তাই হলেন। সেই জন্যে তাঁকে তৎ-সৎ অর্থাৎ সেই সত্যবস্তু বলা হয়।

ব্রহ্ম কি করে 'matter'এ পরিণত হলেন সে সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে কিছু বলা এখানে সম্ভব হলনা, কেননা সেভাবে বলতে গেলে সচ্চিদানন্দ পুরুষ ও সপ্তলোকের তত্ত্ব, মহর্লোকের বিভাগ, পরার্ধ ও অপরার্ধের পরিচয়, তিনটি ব্যাহৃতির স্বরূপ এবং তাদের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ের বিশদ আলোচনা করতে হ'ত। শ্রীঅরবিন্দ অবশ্য

তাঁর The Life Divine গ্রন্থে অধ্যায়ের পর অধ্যায় এই তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন, আমরা এখানে শুধু উপনিষদের উক্তিই বিবৃত করলাম।

উপনিষদের এই তত্ত্ব থেকেই আমরা জানতে পারি যে, পরম চেতনা নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ঘনীভূত হয়ে matter-এ পরিণত হয়েছিলেন। তাহলে আমরা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি ক্রমপরিণামবাদের ধারা ততদিন অব্যাহত থাকবে যতদিন না এই শাশ্বত সত্য স্বরূপের অর্থাৎ এই পরম চেতনার উন্মীলন ঘটছে। সুতরাং মানুষের মধ্যে যে চেতনা প্রকট হয়েছে তাই অভিব্যক্তির শেষ পর্যায় নয়। উন্নত চেতনা এখনও রয়েছে প্রকাশের অপেক্ষায়; এবং মনের ভিতর থেকেই সেই উন্নত চেতনার উন্মীলন সম্ভব হবে। The Life Divine গ্রন্থের Man and the Evolution শীর্ষক অধ্যায়ে এ-সম্বন্ধে যে বিশদ বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা হয়েছে তার থেকেই আমরা জানতে পারি যে, চেতনার অভিব্যক্তিবাদের তত্ত্বের মূলে আছে যে সত্য তা হল এই যে, জড়ের থেকে যখন দেহ গড়ে উঠেছিল, দেহের মধ্যে যখন সঞ্চারিত হয়েছিল প্রাণ এবং দেহ ও প্রাণের আধারে যখন জাগ্রত হল মন তখন যে শক্তির হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়েছিল, অর্থাৎ যে শক্তির অভিপ্রায়ে ঐ চেতনা সব অভিব্যক্ত হতে পেরেছিল, সেই শক্তিকেই বলা যেতে পারে স্রষ্টা বা ঈশ্বর। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—Supraphysical force অর্থাৎ জড়াতীত শক্তি।

শ্রীঅরবিন্দের রচনার মৌলরীতি হল এই যে, যোগ-সাধনার সাহায্যে যে সত্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তা তিনি সোজাসুজিভাবে কোথাও ব্যক্ত করেননি। প্রথমে তিনি কোনও একটি তত্ত্ব সম্বন্ধে যুক্তিবাদী মানুষেরা,—তাঁরা দার্শনিকও হতে পারেন আবার বৈজ্ঞানিকও হতে পারেন,—কি কি যুক্তির অবতারণা করতে পারেন তা বিশদভাবে বিবৃত করেন, তারপর

সেই সেই যুক্তির মধ্যে কোথায় ফাঁক, কোথায় ত্রুটি তা বিশ্লেষণ করে দেখান, এবং সব শেষে যে সিদ্ধান্ত বা মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় তা বিবৃত করেন এবং সেইটাই হ'ল তাঁর উপলব্ধ সত্য। এই বিচার-পদ্ধতির সাহায্যেই তিনি দেখিয়েছেন যে, অভিব্যক্তিবাদের কার্যধারা চেতনার দুইটি ভিন্নমুখী ক্রিয়াশক্তির উপর নির্ভরশীল। একদিকে চাই নীচের থেকে অর্থাৎ পৃথিবীতে যে চেতনা অভিব্যক্ত হয়েছে তার তীব্র আকুতি অন্যদিকে তেমনি চাই এই Supraphysical শক্তির হস্তক্ষেপ যার ফলে ঊর্ধ্বের উন্নততর চেতনার ঘটে অবতরণ। এইভাবেই দেহ ও প্রাণচেতনার তীব্র অভীপ্সার ফলে মনশ্চেতনার উন্মীলন সম্ভব হয়েছে। পরবর্তী উন্নততর চেতনার অভিব্যক্তি যাতে সম্ভব হয়, তার জন্য মনের মধ্যে যাতে তীব্র অভীপ্সা জাগে তার জন্য আমাদের সচেস্ট হতে হবে। কেননা সেই উন্নত চেতনাকে আমাদের সত্তার মধ্যে অভিব্যক্ত করাই হ'ল আমাদের পরম লক্ষ্য। দেহ, প্রাণ ও মন নিয়ে আমাদের যে-সত্তা গড়ে উঠেছে তাকে প্রসারিত করে পরিপূর্ণতা অর্জন করতে হবে। তার মধ্যে নিগূঢ় যে খণ্ড-চেতনা তাকে পূর্ণ চেতনায় রূপান্তরিত করতে হবে, তাকে তার পরিবেশের প্রভু হতে হবে এবং সেইসঙ্গে সমগ্র বিশ্বকে সমন্বয়, সামঞ্জস্য ও একত্রে গ্রথিত করতে হবে। এক কথায় বলতে গেলে প্রাকৃত মানুষকে হতে হবে দিব্যমানুষ। মৃত্যুর পুত্রগণকে স্মরণে রাখতে হবে যে, তারা 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'। এই জন্যেই বলা হয় অভিব্যক্তিবাদের পথে মানুষ হ'ল একটা turning point—the critical stage in earth nature.

—কিন্তু কেন? —মানুষকে দিব্য মানুষ হতে হবে কেন?

এর উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে। If humanity is to survive a radical transformation of human nature is indispensable.

মানুষকে ঘিরে আজ যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার সমাধানের জন্য মানুষের চেষ্টার অন্ত নেই। কিন্তু তবুও মানুষ সফল হতে পারছে না। মানুষ একদিন আশা করেছিল—উন্নত ধরণের শিক্ষা ও বুদ্ধির চর্চার দ্বারা মানুষ উন্নত হবে, মানুষের স্বভাবের রূপান্তর সম্ভব হবে। কিন্তু মানুষের সে আশা ব্যর্থ হয়েছে। শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য আত্মার বিকাশ সাধন—সে উদ্দেশ্য সার্থক করে তুলতে মানুষ সক্ষম হয়নি। শিক্ষার দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত অহংকে স্ফীত করা হয়েছে শুধু।

বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ মনকে অন্তর্মুখী করতে পারেনি। তাই অন্তঃপুরুষকে জানা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। জীবনের পরিচালক অর্থাৎ Governor of life হিসাবে Reasonকে সে স্বীকার করে নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে Reason হল উচ্চতর শক্তির minister, এ-বোধে সে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মানুষ ভেবেছিল Religion তাকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এ ব্যাপারেও সে নিরাশ হয়েছে। Religion এখন বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছে। মানুষ মন্দিরে কাঁসরঘণ্টা বাজিয়ে পূজা করে, মসজিদে গিয়ে আজান দেয়, নমাজ পড়ে, চার্চে গিয়ে করে উপাসনা — এ সবই হয়ে গিয়েছে formal—এই সব আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ নিজের অহংকে পরিতৃপ্ত করতে চেষ্টা করে। অথচ সমস্ত ধর্মের সার কথা হল—পরমপুরুষের সন্ধান করা, পরমপুরুষকে জানা। ধর্মের এ উদ্দেশ্যও অসার্থক থেকে গিয়েছে।

রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে সমগ্র মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার সাম্প্রতিক চেষ্টাও ব্যর্থ হতে চলেছে। ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশকে ব্যাহত করে সমষ্টির কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়। ব্যক্তিকে যেমন নিজের অহংকে খর্ব না করে কিন্তু প্রসারিত করে সমষ্টিগত 'অহং' এর সঙ্গে মিলে মিশে যেতে হবে, তেমনি জাতিগত অহংকে খর্ব না করে, পর্যুদস্ত না করে, পরন্তু তাকে প্রসারিত করে বিশ্বগত ঐক্যে

মানুষকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কিন্তু তার জন্যে অন্তর্জীবনের যে পরিবর্তন দরকার, বাইরের জীবনে প্রযুক্ত কোনও ব্যবস্থা সে-পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হবে না।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে যেমন,—The Human cycle, The Ideal of Human Unity, War and Self-determination ইত্যাদি, মনুষ্যজীবনের বিভিন্ন সমস্যার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। শাণিত যুক্তির সাহায্যে সে-সব সমস্যার বিচার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, সে-সব সমস্যার সমাধানে মানুষের মনোগত শক্তি কত অপ্রতুল, কত অসহায়। তাই তিনি বলেছেন, অন্তর্জীবনের পরিবর্তন ছাড়া মানুষ বহির্জীবনের অতিকায় সব সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে সক্ষম হবে না।

এখন এই অন্তর্জীবনের রূপান্তর সাধনের জন্য একদিকে প্রয়োজন উচ্চতর চেতনার উন্মীলনের জন্য এই দেহ, প্রাণ ও মনকে পরিণত করে তোলা, অন্যদিকে ঊর্ধ্বভূমিস্থ অতিমানস চেতনার অবতরণ সম্ভব করা।

আমরা আগেই বলেছি, উচ্চতর চেতনায় মানুষকে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে অর্থাৎ অতিমানস চেতনার অবতরণকে সম্ভব করে তুলতে হলে আগে জানতে হবে জড়াতীত সেই চিন্ময়ী শক্তির কি অভিপ্রায়। পার্থিব চেতনায় তার অবতরণ সম্ভব কিনা?

প্রশ্নটি অতি সহজ ভাবে বলা হল বটে, কিন্তু এ এক বিরাট প্রশ্ন। সমগ্র মানবজাতির যাবতীয় সমস্যার সমাধান হিসাবে এই ধরণের কোনও উপায়, কোনও পন্থা যে থাকতে পারে এমন ভাবনা, সুদূর অতীত থেকে অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত কোনও দেশের কোনও মানুষকে এমন গভীরভাবে ভাবিত করেনি। এবং এর জন্যে যে কঠোর সাধনার দরকার কোনও দেশের কোনও যোগী, ঋষি কিম্বা সাধু সন্তরা সে সাধনার কথা চিন্তাও করেন নি। বিগত

কয়েক শতাব্দীতে পূর্ব ও পশ্চিমে বহু মনীষী, জ্ঞানী ও গুণীজনের আবির্ভাব ঘটছে, কিন্তু বিশ্বমানুষের যে সমস্যা—সে সমস্যা থেকেই গিয়েছে, আকারে প্রকারে বরং তা আরও জটিল হয়েছে।—কিন্তু কেন ?—এই বিরাট প্রশ্নটি যে মহাপুরুষের মনে প্রথম উদয় হল, এবং সেই প্রশ্নের সমাধানের উদ্দেশ্যে যিনি কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হলেন, তিনি কি শুধু মহাবিপ্লবী! না, সমগ্র মানবজাতির মুক্তিদাতা!—এ-বিচারের ভার ভবিষ্যৎ মানবজাতির জন্য তোলা থাক, আমরা এখন তাঁর বৈপ্লবিক কর্মধারা নিয়েই আলোচনা করি

ক্রমপরিণামবাদ বা অভিব্যক্তিবাদ অর্থাৎ Evo'ution-এর ফলে হাজার হাজার বছর পরে মানুষের চেয়েও উন্নততর চেতনার অধিকারী অতিমানবের উদ্ভব—অবশ্য নীট্শের Superman নয়, —এই পৃথিবীতে হয়ত সম্ভব হবে। কিন্তু সে সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করা যায় কিনা! যদি যায় তাহলে কি উপায়ে?—দুরূহ তপস্যার সাহায্যে সে তত্ত্বও তিনি জেনেছিলেন। এবং প্রাচীন ভারতের ঋষিদের মত সে তত্ত্বের কথা বিশ্ববাসীদের, যাঁরা অমৃতের পুত্র—তাঁদেরও শুনিয়েছেন। কঠোর তপস্যায় যেদিন তিনি ভগবানের প্রত্যাদেশ পেলেন—সেইদিন হল তাঁর মহাসিদ্ধি। তিনি জানতে পারলেন—অতিমানস রূপান্তর পৃথিবীতে ঘটবেই—**The Supramental change is a thing decreed and inevitable in the earth's consciousness**. অর্থাৎ জানতে পারলেন বিধাতার অভিপ্রায়।

কিন্তু তার আগে দেহ, প্রাণ ও মনোগত মানুষকে প্রস্তুত হতে হবে। পার্থিব চেতনাকে সেইভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে করে উচ্চতর চেতনার অবতরণ যখন ঘটবে তখন তা ধারণ করবার শক্তি যেন সে অর্জন করে।

এইবার আমাদের আগের প্রশ্নে ফিরে আসা যাক। আমরা

বলেছিলাম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে কার্য সম্পন্ন করেননি সে কার্য সাধন করতে শ্রীঅরবিন্দ সাহসী হলেন কি করে।

আমাদের আগে অনেকেই এ প্রশ্ন করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং তার জবাবও দিয়েছেন। ১৯৩৫ সালে লেখা একটি চিঠিতে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন,—

"আমি চাইছি এক উচ্চতর সত্যকে। তাতে মানুষএর চেয়েও বড় হতে পারবে কিনা সে প্রশ্নই নয়; কিন্তু যাতে তাদের জীবনের মধ্যে আসে শান্তি, সত্য ও আলো, তাদের জীবন যাতে এখনকার অজ্ঞতা ও অসত্য ও জ্বালা যন্ত্রণা, ও দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে নিত্য সংঘর্ষপূর্ণ হয়ে থাকার চেয়ে ভালরকম কিছু হয়ে ওঠে ······অতিমানসকে আমি নামিয়ে আনতে চাই নিজেকে বড় করবার জন্যে নয়। মানুষের বিচারে আমি বড়ই হই আর ছোটই হই—তার জন্যে আমি কিছু গ্রাহ্য করি না। আমি কেবল চাই যে, এই পার্থিব চেতনায় কিছু আভ্যন্তরীণ সত্য এবং আলো এবং সঙ্গতি এবং শান্তি এসে পড়ুক।··· আমার চেয়েও মহৎ পুরুষেরা এটা যদি না দেখে থাকেন এবং এ আদর্শ যদি তাঁদের দৃষ্টিতে উদ্ঘাটিত না হয়ে থাকে, তথাপি আমি যে সত্যদৃষ্টি ও সত্যানুভব পেয়েছি, নিশ্চয়ই তাকে অনুসরণ করতে আমি নিবৃত্ত থাকব, এমন্ট হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণও যে চেষ্টা করেননি আমি সেই চেষ্টাই করতে যাচ্ছি বলে লোকের বুদ্ধির কাছে আমি যদি নির্বোধ বলে প্রতিপন্ন হই, তাতেও কিছু যায় আসেনা। এখানে অমুক কিংবা তমুক কি বলছে তা নিয়ে প্রশ্নই নয়। এ হল কেবল ভগবান ও আমার নিজের মধ্যে বোঝাপড়ার প্রশ্ন। স্বয়ং ভগবানের তাই ইচ্ছা কি না! তিনি আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন সেই জিনিসকে নামিয়ে আনতে কি না! অথবা তার অবতরণের পথ খুলে দিতে কিনা! অথবা অন্ততঃপক্ষে সেটা অপেক্ষাকৃত আরও সহজ করে তুলতে কিনা!

—তাই নিয়ে কথা। আমার এই দুঃসাহসিক ধারণা পোষণ করার জন্যে সকল লোকে আমাকে যতই টিট্‌কারী দিক কিংবা আমার উপর নরকপাতই ঘটুক—তবু আমি একাজ শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাব। তাতে আমি জয়ী হই কিংবা ধ্বংস হয়ে যাই—এই মাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই আমি অতিমানসকে এখানে চাইছি—নিজেকে বা অন্য কাউকে বড় করে তোলার মতলবে নয়।"

শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন The Complete Divine Manhood. তিনি এসেছিলেন মানুষকে দিব্য জন্মে ও দিব্য কর্মে দীক্ষা দেবার জন্যে। যাই হোক, আমাদের আরও প্রশ্ন ছিল—শ্রীঅরবিন্দের আগে অনেক মহাপুরুষ জন্মেছেন তবুও মানুষের কোন উন্নতি হয়নি।—এর উত্তর আমাদের আলোচনার মধ্যেই দেওয়া হয়েছে এবং শ্রীঅরবিন্দের এই চিঠিটার মধ্যেও এর কিছুটা ইংগিত আছে। তবে এ প্রসঙ্গে আরও দু'একটি কথা বলা দরকার। শ্রীঅরবিন্দের যোগের সঙ্গে অন্য সব যোগের কিছু পার্থক্য আছে। মোটামুটিভাবে আমরা তিনটি পার্থক্য দেখতে পাই :—

প্রথমতঃ—শ্রীঅরবিন্দের যোগ এই জগৎটাকে অস্বীকার করেনি। পার্থিব চেতনার সমস্ত অসম্পূর্ণতা, অজ্ঞানতা ও অন্ধতার অপসারণ ঘটিয়ে তার শাশ্বত পরিবর্ত্তন সাধনই এ যোগের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়তঃ—শ্রীঅরবিন্দের যোগ ব্যক্তিগত মুক্তি বা নির্বাণ লাভের জন্য নয়। সমগ্র মানবজাতির চেতনার রূপান্তর সাধনের জন্যই এই যোগ। এই প্রসঙ্গে একটা কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য এই যোগ নয়, এই যোগ ভগবানের জন্য, ভগবানের অভিপ্রায়কে সার্থক করার জন্য।

তৃতীয়তঃ—এই যোগের পথ আলাদা। যার জন্য এই যোগকে বলা হয় পূর্ণযোগ বা Integral yoga.

এই পূর্ণযোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা তিনি করেছেন বিভিন্ন গ্রন্থে। তাছাড়া বহু ভক্ত সাধকেরাও এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা

করেছেন। উৎসাহী পাঠকেরা সেই সব গ্রন্থ পড়বার চেষ্টা করতে পারেন।

এখানে আর একটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সেটি হল -পরবর্তী উন্নততর চেতনায় উত্তীর্ণ হতে হলে মানুষকে সর্বাগ্রে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে হবে। কিন্তু কি করে সেই পরিপূর্ণতা বা Perfection সে অর্জন করবে ?

—প্রশ্নটা নিয়ে আগেই আলোচনা করা যেত, কিন্তু মূল প্রশ্নের সংগে এই বিষয়টির বিশেষ সম্বন্ধ নেই বলে আলোচনা করিনি। তাছাড়া এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে গেলে—মানুষের অন্তঃপুরুষের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হয়। সেই জন্যে এই প্রশ্নটি আগে আমরা উত্থাপন করিনি। যাই হোক এখানে সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে—

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।

এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥

এই শরীরকে বলা হয় ক্ষেত্র এবং যিনি এই ক্ষেত্রের সমস্ত রহস্য অবগত হন, তাঁকেই বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ।

তাহলে সর্বাগ্রে মানুষের এই শরীরটাকে ভালভাবে জানতে হবে। আমরা আগেই বলেছি—দেহ, প্রাণ ও মন নিয়েই মানুষের শরীর। দেহ হল ভোগের আয়তন, প্রাণ শক্তির এবং মন হল জ্ঞানের আয়তন। মানুষের এই শরীরটিকে এই তিনটি আয়তন অনুযায়ী তিনটি কেন্দ্রে ভাগ করা যায়।

ভোগের আয়তনের কেন্দ্র হল—পা থেকে নাভিমূল পর্যন্ত দেহের বিস্তীর্ণ অংশ। কর্ম-আয়তনের কেন্দ্র—নাভিমূল থেকে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। এবং জ্ঞানায়তনের কেন্দ্র হল—হৃৎপিণ্ড থেকে মূর্ধা পর্যন্ত দেহের অংশ।

আমাদের মধ্যে যে পুরুষ রয়েছেন, যাঁকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন

psychic being—সেই পুরুষ যে কোনও একটি কেন্দ্রে অধিষ্ঠান করেন। আমরা বাইরের জীবনে যে ধরণের কর্ম-বৃত্তি গ্রহণ করি আমাদের পুরুষ ঠিক সেই ধরণের কেন্দ্রে অধিষ্ঠান করেন। যদি আমরা দেহের কামনা বাসনা নিয়েই আমাদের সমস্ত কর্মপ্রবণতাকে ব্যস্ত রাখি অর্থাৎ শারীর ভোগের প্রেরণাতেই যদি আমরা সব কাজ-কর্ম করি, তাহলে আমাদের পুরুষ আশ্রয় নেন নাভি-মূলের নীচে। যখন আমাদের মধ্যে জাগে এমন কর্মোন্মাদনা যার সার্থকতায় আমাদের 'অহং', অর্থাৎ 'কাঁচা আমি' পরিতৃপ্ত হয়,— যশ, খ্যাতি, অর্থ, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি লাভ হয়, তখন আমাদের পুরুষ হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রে অবস্থান করেন। এবং যখন আমাদের জ্ঞানৈষণা প্রবল হয়,—ইতিহাস, সাহিত্য-কাব্য-শিল্পকলা ইত্যাদি বিষয়ে আমরা আগ্রহী হই, নিজে কিছু সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হই অথবা অপরের সৃষ্টির রস আস্বাদন করে আনন্দ পাই তখন আমাদের পুরুষ অধিষ্ঠান করেন তৃতীয় কেন্দ্রে।

আমরা আগেই বলেছি যে, আমরা মনোময় পুরুষ অর্থাৎ mental being, সুতরাং আমাদের অন্তঃপুরুষের সঠিক ক্ষেত্র হল—মস্তিষ্ক বা মূর্ধাকেন্দ্র। অপর দুইটি কেন্দ্রে যখন তিনি ওঠানামা করেন তখন বুঝতে হবে তিনি কেন্দ্রচ্যুত হয়েছেন। অর্থাৎ বাইরের জীবনে মনুষ্যেতর অবস্থায় আমাদের অবনতি ঘটেছে। কেবল মাত্র দেহ ও প্রাণের বাসনা কামনাকে পরিতৃপ্ত করবার জন্য আমরা যদি মনঃশক্তিকে নিয়োগ করি তাহলেই আমাদের অন্তঃপুরুষ কেন্দ্রচ্যুত হন। কেননা দেহ ও প্রাণ নিয়ে মানুষের পশুভাব, দেহ ও প্রাণ চেতনার অনেক পরে মনশ্চেতনার উন্মীলন ঘটেছে। সুতরাং মনের শক্তি অনেক বেশী। সে শক্তিকে দেহ আর প্রাণ যদি দাস করে রাখে, প্রভু হতে না দেয়, তাহলে মন তার স্বধর্ম অনুসরণ করে কি করে! মনের কাজ হল দেহ ও প্রাণের বাসনাগুলোকে পরিশুদ্ধ করে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে ঠিক পথে পরিচালিত

করা। কিন্তু আমরা দেহ ও প্রাণের দ্বারাই মনকে পরিচালিত করছি। তাই এই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও সমগ্র পৃথিবীর গোষ্ঠীগত মানুষ আধা-পশুই থেকে গিয়েছে ; পুরোপুরি মানুষ হতে পারেনি।

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন,—মনের ত্রিধা শক্তি—Thinking, Feeling এবং Willing, জ্ঞান, ইচ্ছা ও বেদনা এই তিনটি শক্তিকে কিংবা তার যে কোনও একটিকে অবলম্বন করে মানুষ যদি অন্তর্মুখী হয় তাহলে সে 'বোধি'র সন্ধান পায়। এবং এই 'বোধি'র সাহায্যেই সে জানতে পারে তার অন্তঃপুরুষকে। এই তিনটি শক্তিকেই আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে—যথাক্রমে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মযোগ।

সুতরাং এখন বোধ হয় আমরা বুঝতে পেরেছি—আমাদের কি করা উচিত আর আমরা কি করছি, এবং কেন আমরা পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারছি না।

এবার আমরা আবার আমাদের মূল প্রশ্নে ফিরে যাই। মানুষকে উন্নততর অবস্থায় দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে বাইরের জীবনে যে সব পন্থা আমরা অবলম্বন করি—তাকেই বলে থাকি বৈপ্লবিক পন্থা। অন্তর্জীবনের পরিবর্তনেরও যে প্রয়োজন আছে তা আমরা স্বীকার করি না। তাই শ্রীঅরবিন্দকে বুঝতে বা তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করতে আমরা উদ্যোগী হইনি। যাঁরা শ্রীঅরবিন্দকে জেনেছেন,—অবশ্য পুরোপুরি জানা কারও সাধ্য নয়, তাঁরা এ কথা দৃঢ় নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারেন যে, এক মহা-বিপ্লবের সাধনায় তিনি হলেন সার্থক ঋষি।

Evolutionকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে তাঁকে যে কী কঠোর সাধনা করতে হয়েছিল তার পরিচয় আমরা পাই তাঁর অমর সৃষ্টি 'সাবিত্রী' মহাকাব্যে।

যে বিধান অচলপ্রতিষ্ঠ নয়, যা মানব জাতিকে উন্নত অবস্থায়

উন্নীত করতে সক্ষম নয়, বিপ্লবের সাহায্যে তাকেই আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। ফলে পরবর্তীকালে সে বিধান যখন তার কার্যকরী শক্তি হারিয়ে ফেলে তখন অন্যতর ব্যবস্থা প্রবর্তনে আমরা বিপ্লবের পথ গ্রহণ করি। এইভাবেই আমরা এগিয়ে চলেছি, এই ভাবেই আমরা আরও এগিয়ে যাব।

কিন্তু ও পথ যে ভ্রান্ত সে কথা প্রথম আমাদের শোনালেন শ্রীঅরবিন্দ। বললেন, The whole heart and action and mind of man must be changed, but from within and not from without, not by political and social institutions not even by creeds and philosophies, but by realisation of God in ourselves and the world and remoulding of life by that realisation ....(The Yoga and its objects P....5)। কিন্তু আমরা কি শুনেছি সে কথা,—শুনিনি। শ্রীঅরবিন্দ জানতেন কেউ শুনবেনা. তাই মানুষের রুদ্ধদ্বারে আঘাত না করে ভগবানের দ্বারে গিয়ে তিনি আঘাত করলেন। তারপর ভগবানের প্রত্যাদেশ পেয়ে আশ্বস্ত হয়ে গভীরতর তপস্যায় আবার নিমগ্ন হলেন। সে সাধনা তাঁর এখনও চলছে। অথচ পৃথিবীর মানুষ জানে না, কোথা দিয়ে কেমন করে কী গভীর পরিবর্তন সংসাধিত হয়েছে, হচ্ছে এবং এখনও হবে। মানুষ রূপান্তরিত হবে দেবতায়, এই পৃথিবীই হবে তার আবাসভূমি।

মনুষ্যচেতনার এই বিরাট রূপান্তর সাধনকে সত্যই বিপ্লব বলা যায় কিনা সে প্রশ্নের মীমাংসা মানুষের অভিধানে নেই,—তাই বুদ্ধিবাদী যুক্তিবাদী মানুষের সংশয় আজও ঘোচেনি,—আজও সন্দিগ্ধ মানুষের প্রশ্ন—**শ্রীঅরবিন্দ কি সত্যই মহাবিপ্লবী?—**